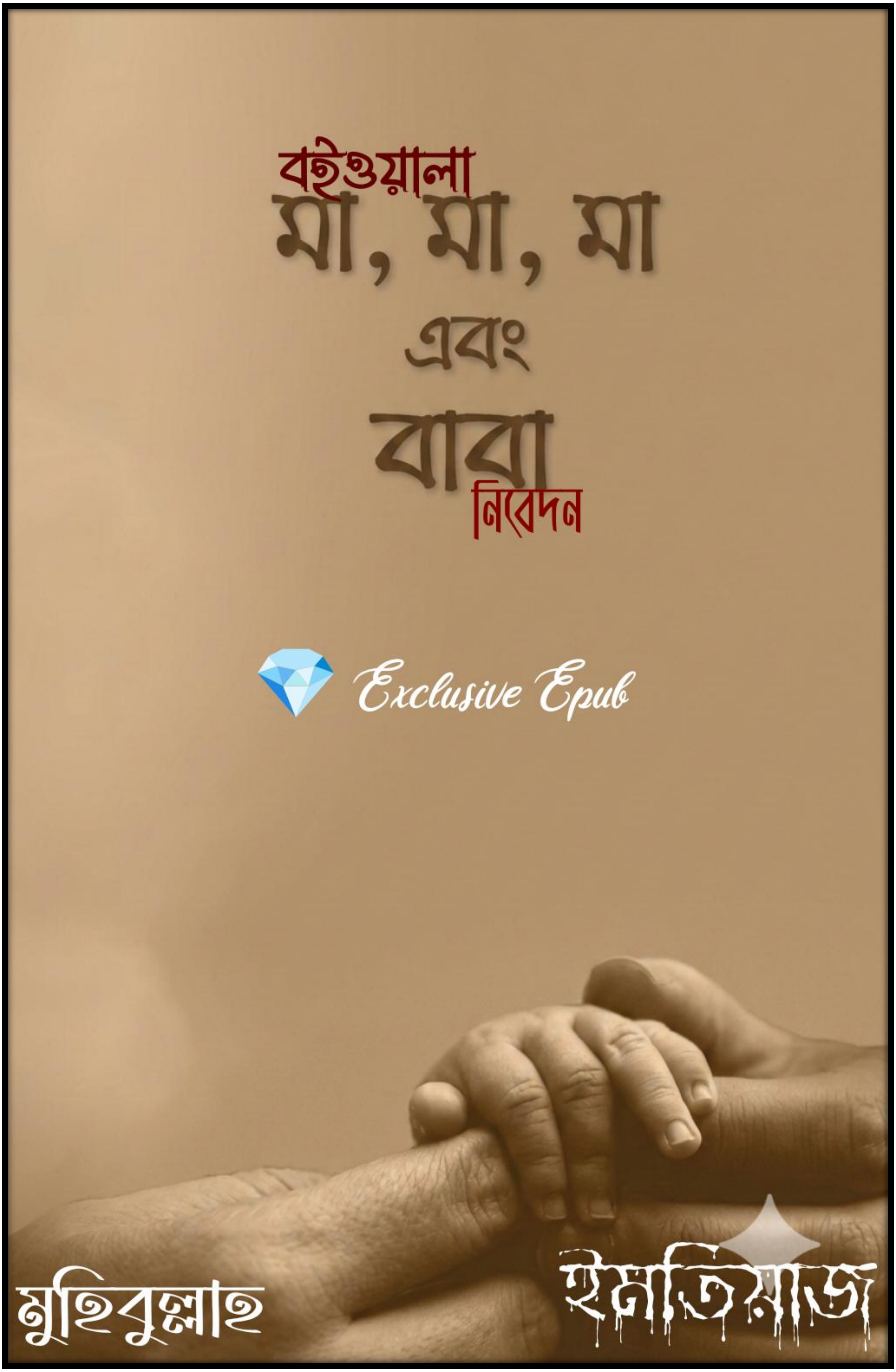

বইওয়ালা
মা, মা, মা
এবং
বাবা
নিবেদন
Exclusive Epub
মুহিবুল্লাহ
ইমতিয়াজ

Acknowledgements & Fair Use Notice

Personal Intent & Grace
This digital edition was prepared solely for my own personal use and benefit. If our brothers and sisters find this work beneficial to their own learning and spiritual growth, then this is truly an Ehsan (Grace and Favor) from Allah Sub'hanahoo Wa Ta'ala. Any good within this work is from Allah, and any errors are my own.

Our Gratitude To:

- Zahid Hasan Bhai (@ZahidKhair): Special thanks for your constant support and brotherhood, from you I learned proofreading within the Islamic eBook Creator Team(https://t.me/IslamicEbookCreatorTeam).

Support & Updates:

If you appreciate this work, please support the author by purchasing a hard copy. To join my personal group for more eBooks and resources, click the link below: 🌐 Boiwala বইওয়ালা

মা, মা, মা

এবং

বাবা

শারয়ী সম্পাদনা:

শাইখ আহমাদুল্লাহ

সংকলন ও সম্পাদনা:

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৮

চতুর্দশ প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২০

একমাত্র পরিবেশক:

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন: ০১৬১১৮৬৪৬৮৮

Published by: Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh.

Price: Tk. 235.00 | US $ 10.00 only.

ISBN: 978-984-34-3958-1

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন: ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

সূচিপত্র

২৪رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا آيه ﴿﴾

হে আমার রব, তাদের প্রতি সেভাবে দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসূল! কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?"

তিনি বললেন, "তোমার মা।"

লোকটি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" ওই ব্যক্তি চতুর্থবার প্রশ্ন করল, "তারপর কে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার বাবা।"

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে আদেশ করেছেন, "...তোমরা মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো।" ۝ آیه২৩। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের বাবা-মারা অধিকাংশ সময়ই আমাদের থেকে যথাযথ মূল্যায়ন পান না। আমরা যখন বড় হই, দুনিয়াকে চষে বেড়াতে শিখি, যখন মায়ের আঁচল কিংবা বাবার হাতের আঙুল ছাড়াই আমরা চলতে পারি, তখন আমরা তাদের ভুলে যাই।

এই বইটি কিছু টুকরো টুকরো গল্প দিয়ে সাজানো। বইয়ের বেশকিছু গল্প শাইখ আবদুল মালিক মুজাহিদের *Loving Our Parents* বইটি থেকে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বদলা দান করুন। গল্পগুলো আমাদের চারপাশের সমাজ থেকেই উঠে আসা। পাঠকদের সামনে গল্পগুলো উপস্থিত করার উদ্দেশ্য হলো, বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসাকে আমাদের মধ্যে নতুন করে জাগিয়ে দেওয়া। বাবা-মায়ের প্রতি যে সন্তান উদাসীন, যার হৃদয়ে বাবা-মায়ের জন্য ভালোবাসার ঘাটতি দেখা দিয়েছে, যার হৃদয় তাদের প্রতি কঠিন হয়ে পড়েছে, সেই কঠিন হৃদয়, অনুর্বর অন্তর আর বিস্মৃত আত্মাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস।

আর যাদের অন্তর বাবা-মায়ের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, তাদেরকেও এই সুসংবাদ জানিয়ে দেওয়া—যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন। বইটি পড়ে কোনো পাষাণ হৃদয় যদি গলে ওঠে, অন্তঃসারশূন্য কোনো হৃদয়ে যদি ভালোবাসার ফোয়ারা নেমে আসে, যদি কোনো বিস্মৃত অন্তর নতুন করে ভাবনার সুযোগ পায়—তবেই আমাদের কষ্ট সার্থক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের চেষ্টাগুলো কবুল করুন, আমীন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

সম্পাদকের কথা

সমকালীন প্রকাশন-এর প্রকাশক একদিন আমাকে তাদের একটি বই সম্পাদনা করে দেওয়ার জন্য বললেন। বই সম্পাদনা করা যে কী পরিমাণ ঝামেলার কাজ—সেটা আমি কিছুটা হলেও তখন বুঝতে শিখেছি। একটি বই সম্পাদনা করা একটি নতুন বই লেখার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক একটি বই লেখার চেয়ে সম্পাদনা ঢের শক্ত কাজ; কিন্তু সমস্যা হলো, আমি যে তাদের মুখের উপর 'না' বলে বসব, সে উপায়টাও নেই। কারণ, আলোচ্য বইয়ের পেছনে একটি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বেদনাবিধূর স্মৃতি। এই বইটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল দেশের প্রথিতযশা প্রকাশনী 'সরোবর প্রকাশন' থেকে। বইয়ের প্রাথমিক খসড়া দাঁড় করিয়েছিলেন 'বাক্সের বাইরে' এবং 'তত্ত্ব ছেড়ে জীবনে'র মতো দুর্দান্ত বইয়ের লেখক শরীফ আবু হায়াত অপু ভাই, যিনি আবার 'পড়ো' বইয়ের মতো পাঠকনন্দিত বইয়েরও সম্পাদক। অপু ভাইয়ের সাথে সহযোগী হিসেবে ছিলেন আমাদের সময়কার অন্যতম সুলেখক আরমান ইবন সুলায়মান ভাই। সে যাহোক, এরপর একদিন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল 'সরোবর প্রকাশন'। মার্কেটে আসা বন্ধ হয়ে গেল 'পড়ো', 'ফেরা' এবং 'বাক্সের বাইরে'।

একদিন জানতে পারলাম 'পড়ো' এবং 'ফেরা' নতুন করে বাজারে আসছে। কে আনছে? 'সমকালীন প্রকাশন'। যাক, আলহামদু লিল্লাহ; বইগুলো নতুন করে বাজারে আসছে দেখে আমি বেশ আপ্লুত হলাম।

যে বইটির কথা বলছি, এই বইটির স্বপ্ন দেখেছিল সরোবর পরিবার। বইটির স্বপ্নদ্রষ্টা শরীফ আবু হায়াত অপু ভাই। 'সরোবর' এবং 'অপু ভাই' তখন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এই লোকটিকে দেখতে দেখতেই তো আমরা দ্বীনে এসেছি। এই লোকটির কাছ থেকেই শেখা, দ্বীনে ফেরার পরে কীভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পথ পাড়ি দিতে হয়। অপু ভাই আমাদের জীবনে একটি বাতিঘরের মতো। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা, আমাদের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু।

দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলাম। 'মা, মা, মা এবং বাবা' আমিই সম্পাদনা করব। এখনো মনে আছে আমার, এক সন্ধ্যেবেলা অপু ভাইয়ের বাসায় অপু ভাইয়ের সাথে আলাপ করছিলাম। তিনি বললেন, "আরিফ, তোমার প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ কত মানুষের কাছে পৌঁছেছে? মানে, কত কপি সেল হয়েছে?"

আমি মিনমিন করে বললাম, "হবে হয়তো পঞ্চাশ হাজারের মতো।"

ভাইয়া তখন আমার দিকে সুদৃঢ় এক চাহনি দিয়ে বললেন, "তোমার বইটি যদি পঞ্চাশ হাজার মানুষের নিকট পৌঁছায়, এই বইটি (মা, মা, মা এবং বাবা) এক লাখ মানুষের নিকট পৌঁছানো উচিত। এটি সেরকম একটি বই।"

ভাইয়া আরও বললেন, "এই বইটি পড়ে কাঁদবে না, আবেগাপ্লুত হবে না— এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। আমি যখন এই বইটি নিয়ে কাজ করি, একবার এতই আবেগী হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি অফিস থেকে এসে

গরম পানি করে আমার আম্মার পা ধুইয়ে দিয়েছিলাম। আমার আম্মা কতজনের কাছে যে করেছে সে গল্প! তিনি বলতেন, ‘আমার অপু আমার পা ধুইয়ে দেয়।’ তো এটি সেরকম একটি বই। বইটি যে একবার পড়বে, তার বাবা-মা যদি বেঁচে থাকে, সে বাবা-মায়ের প্রতি এমন অনুগত হয়ে যাবে যে, যা সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি। আর, যাদের বাবা-মা বেঁচে নেই, তারা তাদের বাবা-মায়ের জন্য সালাতে দাঁড়িয়ে হুঁহুঁ করে কাঁদবে।”

আমি অপু ভাইয়ের কথাগুলো মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনছিলাম। এতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে যখন অপু ভাই বলেন, তখন সেটা অবশ্যই অবশ্যই ভিন্নরকম কিছু। ‘মা, মা, মা এবং বাবা’ বইটি সম্পাদনার আগ্রহ আমার তখন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

এরপরের মাসের কথা। সবে বইটির ফাইল নিয়ে বসলাম। গল্পগুলোর সম্পাদনা করতে গিয়ে এমন হচ্ছিল, আমার চোখের পানিতে ল্যাপটপের কি-বোর্ড ভিজে যাচ্ছে। চোখটা বার বার ঝাপসা হয়ে উঠছে। আমার তখন মনে হচ্ছিল, আমি এক্ষুনি উড়াল দিয়ে আমার মায়ের কাছে চলে যাই। গিয়ে তাঁর পা ধরে বসে থাকি। এ যাবৎকালের সমস্ত অন্যায়, অবিচার আর অবাধ্যতার জন্য মাফ চাই... আমার মন চাচ্ছিল, আমি শিশুদের মতো ‘মা মা’ বলে হাউমাউ করে কাঁদি...

বাবার বুকে মাথা গুঁজে বলি, “বাবা, আমাকে তুমি মাফ করে দিয়ো। কত অবাধ্য ছেলেই না আমি তোমার...।”

এরপরের দিন অফিসে জানিয়ে দিলাম যে, আমার এক সপ্তাহ ছুটি দরকার। আমি বাড়ি যাব। আমার ছুটি মঞ্জুর হলো। আমি ঠিক এর পরেরদিনই চট্টগ্রামে চলে গেলাম। সারাটা পথ আমার মন বিষণ্ণ ছিল। একটা বই একটা মানুষের মনকে এতটা নাড়া দিয়ে যেতে পারে, আমি ভাবতেই পারছিলাম না। সেদিন সন্ধ্যেবেলা অপু ভাইয়ের বলা কথাগুলোও মনে পড়ছিল বার বার...

কথা ছিল বইটি 'বইমেলা ২০১৮'-তে প্রকাশিত হবে। সেরকম প্রস্তুতিও ছিল প্রকাশনীর। আমি আমার পক্ষ থেকে সম্পাদিত কপি জমা দিয়ে দিলাম; কিন্তু বেঁকে বসলেন অপু ভাই। বললেন, "খবরদার! কাঁচা কাজ যেন না হয়। এটা কিন্তু এমন একটা বই—যা মানুষ পড়ে অন্যজনকে পড়তে বলবে। কাঁচা কাজ হলে কিন্তু কোনোভাবেই চলবে না। বইমেলাতেই আনতে হবে—এমন কোনো কথা নেই। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। তাড়াহুড়ো করা শাইতানের কাজ। আস্তে আস্তে কাজ করো। বেস্ট একটা কাজ হওয়া চাই।"

অপু ভাইয়ের কথা শুনে 'সমকালীন প্রকাশন' শিডিউল পিছিয়ে দিল। বইমেলায় আসার কথা থাকলেও বইটা মেলায় আর আসেনি...

আমি বইটি নিয়ে আবার বসলাম। আবার পড়তে গিয়ে দেখলাম, কাজটা আসলেই কাঁচা রয়ে গেছে। সম্পাদনার কাজে এই এক প্যারা। যতবার পড়া হবে, মনে হবে, "আরে, আরও কাজ করা লাগবে। এটা এভাবে না হয়ে, ওভাবে করলে ভালো হতো...।" ব্যস, বইটি নিয়ে আবারও কাজে লেগে গেলাম। এরপর কেটে গেলো মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট। ছয়-

ছয়টা মাস। দীর্ঘ পরিশ্রম, সমকালীনের সম্পাদক প্যানেলের আপ্রাণ প্রচেষ্টা আর যত্নে অবশেষে বইটি মনের মতো হয়ে উঠল; কিন্তু প্রচ্ছদ...?

মধুর এই বিড়ম্বনার সেখানেই শেষ ছিল না। এরপর এই বইয়ের কাভার নিয়েও কত কাহিনি হলো। যেহেতু আমি সম্পাদনা করেছি, তাই কাভারের আইডিয়া দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। আমি আইডিয়া দিলাম। কাভার হলো। সেই কাভার আমি আবার অপু ভাইকে দেখালাম। অপু ভাই বললেন, “চলবে না”।

আবার কাভার করা হলো। আমার পছন্দ হলো। অপু ভাইকে দেখালাম। ভাই বললেন, “চলবে না”।

তখন আসলে কী যে চলবে, আর কী চলবে না—তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি হাল ছেড়ে দিলাম। এবার দায়িত্ব অপু ভাইয়ের। তিনি নিজে সমকালীনের ক্রিয়েটিভ টিমকে কাভারের আইডিয়া বুঝিয়ে দিলেন। এরপর অনেক জল্পনা-কল্পনার শেষে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কাভার হলো, আলহামদু লিল্লাহ!

এই কথাগুলো যখন লিখতে বসেছি, আমার আবারও অপু ভাইয়ের বাসার সেই সন্ধ্যের মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ছে। ইচ্ছে করছে, ভাইয়ের কথাগুলোর সাথে আমিও বলি, “এই বইটি প্রতিটি সন্তানের জন্য অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। এটি এমন একটি বই—যা নিছক কোনো বই-ই নয়, এর চেয়ে বেশি কিছু। খুব আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলতে পারি, এই বইটি পড়বে কিন্তু মন কেঁদে উঠবে না, বাবা-মায়ের জন্য মন খারাপ হবে না, বাবা-

মায়ের সাথে করা অন্যায়ের ব্যাপারে পাপবোধ জন্ম নেবে না—এমন খুব কম লোকই পাওয়া যাবে, ইন শা আল্লাহ।”

এই বইটি পড়ে যদি কোনো সন্তান তার মা-বাবার প্রতি সদয় হয়, যদি তার হৃদয় বিগলিত হয়, যদি সে তার ভুল বুঝতে পেরে সংশোধিত হয়—তাহলেই এই বইটির পেছনে করা কাজ সার্থক হবে, ইন শা আল্লাহ।

জীবনে আমি হয়তো আরও অনেক বই সম্পাদনা করব, ইন শা আল্লাহ; আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট, ভালো ভালো বই হয়তো পড়ে দেখার, কাজ করে দেওয়ার সুযোগ—আল্লাহ চান তো হবে আমার; কিন্তু, আর কোনো বই পড়ে কি আমার ল্যাপটপের কি-বোর্ড ভিজবে? চোখ বার বার ঝাপসা হয়ে উঠবে? আর কোনো বই নিয়ে কি আমি এরকম স্মৃতিকাতুরে হয়ে পড়ব? আমি জানি না...

আরিফ আজাদ

arifazad.bd@outlook.com

বইওয়ালা নিবেদন...

এই বইটি এ আই (AI) এবং ম্যানুয়েল চেকআপ এর মাধ্যমে বানানো হয়েছে। যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে প্রুফ রিডিং করার। এরপরেও মূল বইয়ের কিছু শব্দ বা বাক্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমরা মূল বই মিলিয়ে পড়ার সুপারিশ করি। ***বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি কিনে লেখক-প্রকাশক কে সহায়তার ব্যাপারে বিবেচনা করুন।*** আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং আমাদের ভালো গুলো কবুল করে নিন। যা কিছু ভুল ভ্রান্তি সব আমাদের তরফ থেকে আর যা কিছু সঠিক সমস্ত কিছু আল্লাহতালার তরফ থেকে।

Boiwala Presents...

জীবন থেকে নেওয়া

মায়ের চিঠি

প্রিয় খোকা,

বেশ কিছুদিন ধরে তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। ঘুরেফিরে কেবল পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলোই চোখের সামনে ভেসে উঠছে বার বার। তখন সময়টা ছিল বিয়ের প্রায় বছর দেড়েক পর। একজন নারী তার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় যে সংবাদ পেতে পারে, সেই সংবাদ আমিও পেয়েছিলাম। তুমি জানো, কী ছিল সেই সংবাদ—যা আমাকে জীবনের পরম আনন্দে ভাসিয়েছিল? সেটা ছিল তোমার অস্তিত্বের সংবাদ। আমাকে বলা হয়েছিল, আমার গর্ভে তুমি এসেছ। বাবা আমার, আমি তোমাকে কোনোভাবেই সেই মুহূর্তের কথা বলে বোঝাতে পারব না। আমার গর্ভে তোমার অস্তিত্বের সংবাদ যে আমাকে কী রকম আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়েছে—সেটা তুমি কোনোদিনও বুঝবে না।

তারপর অনেকগুলো সপ্তাহ কেটে গেল। আমার শরীরে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে লাগল। শরীরের এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আমি ভয়ও পাচ্ছিলাম। কারণ, আমি যা-ই খেতাম তা-ই বমি হয়ে যেত। প্রচণ্ড দুর্বলতা এসে আমার শরীরে ভর করতে লাগল। তুমি বড় হওয়ার সাথে সাথে আমার শরীরও দিন দিন বড় হতে লাগল। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তুমি গর্ভে আসার পর আমার শারীরিক দুর্বলতা, অসহনীয় ব্যথা, খেতে বা ঘুমোতে না পারা সত্ত্বেও যতই দিন গড়াচ্ছিল, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ততই বেড়ে চলছিল।

আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্নে সবখানে শুধু তুমি আর তুমি। এভাবে দিনগুলো সপ্তাহ আর সপ্তাহগুলো মাসে পরিণত হতে লাগল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমিও যেন ভারী হয়ে গেলাম। আমি এত বেশিই ভারী হয়ে উঠলাম যে, কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। বেশিক্ষণ হাঁটতে পারতাম না। এরপর এমন একটা সময় এলো যখন আমি চিৎ হয়ে ঘুমাতেও পারতাম না। কেন জানো? কারণ, তোমার ওজন আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা তৈরি করত। তাই আমি পাশ ফিরে ঘুমাতাম। তবুও আমার ভেতরে একটা ভয় কাজ করত। ভাবতাম, পাশ ফিরে ঘুমাতে গিয়ে আবার তোমার গায়ে কোনো আঘাত লাগে কি না! তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় কি না সারাক্ষণ এই ভয় আমার ভেতরে কাজ করত। এই আশঙ্কা নিয়েই কত রাত আমার নির্ঘুম কেটে গেছে—তুমি জানো না। কত বিচিত্র আর ভালোলাগার ছিল সেই প্রহরগুলো।

এভাবেই দিন যত যাচ্ছিল, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা তত বাড়ছিল। তোমার প্রতি আমি আরও বেশি মনোযোগী, আরও বেশি যত্নশীল হয়ে উঠছিলাম। তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে আমার তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। আমি নীরবে কান পেতে শুনতাম। তুমি কোনো শব্দ করছ কি না, নড়াচড়া করছ কি না। যখনই তুমি নড়ে উঠতে, আল্লাহর কসম, মনে হতো—আমি যেন তখনই মারা যাব। প্রচণ্ড ব্যথায় আমি কুঁকড়ে উঠতাম। আমি যেন নিজের ভেতর নিজেই গুটিয়ে যেতাম। বিশ্বাস করো, মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে সেই ব্যথা আমি কত শত বার নিজের ভেতরে চাপা দিয়ে দিয়েছি। কাউকে জানতেও দিইনি। কেন জানো? শুধু তোমার জন্য।

এরপর... একদিন সেই সময়টা এলো। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! সেদিন আমি এমন এক ব্যথা অনুভব করলাম—যা আমি এর আগে কখনো অনুভব করিনি। এমন এক ব্যথা—যার কারণে আমার মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি মারাই যাব। ব্যথার পর ব্যথা! চাপের পর চাপ! সেকেন্ডের পর সেকেন্ড! মিনিটের পর মিনিট! আল্লাহর কসম, সেই সময়টাকে আমার সারা জীবনের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। সেই মৃত্যুসম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম; বিশ্বাস করো, তখনো একটি বারের জন্য আমি তোমাকে অভিশাপ দিইনি। এক মুহূর্তের জন্যও আমি তোমাকে দোষারোপ করিনি; বরং সে সময়েও আমি এক অন্যরকম আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছের কাছে জগতের সকল যন্ত্রণা, সকল ব্যথা যেন পরাজিত হয়ে গেল। অপরিসীম ভালোবাসা, আদর আর মায়াভর্তি এক হৃদয় নিয়ে আমি তোমার জন্য প্রহর গুনছিলাম।

অতঃপর তুমি পৃথিবীতে এলে। শপথ সেই সত্তার—যার হাতে আমার প্রাণ, তোমার চেহারা দেখামাত্রই সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ-ব্যথা যেন নিমিষেই মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ যে ব্যথা আমার কাছে মৃত্যুসম মনে হচ্ছিল, সেটা যেন কর্পূরের মতো কোথায় উবে গেল এবং আমার দুচোখে ব্যথা আর যন্ত্রণার যে অশ্রু ছিল, মুহূর্তেই সেটা আনন্দের অশ্রুতে পরিণত হলো। যখন আমি তোমাকে ধরলাম এবং বুকে টেনে নিলাম, আমি হাসলাম আর বললাম, “সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা!” আল্লাহ আমাদের এক মহা আশীর্বাদ দান করেছেন। এক মহা নিয়ামত দান করেছেন।

প্রিয় সন্তান, এরপর সেই নির্ঘুম রাতগুলোর গল্প কি তুমি শুনবে না? তুমি জানো, কেন সেই রাতগুলো আমার নির্ঘুম কেটেছিল? তোমার জন্যে। কারণ, আমি সহ্য করতে পারতাম না তোমার এতটুকু কান্নাও। তোমাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কত রজনী আমি কাটিয়ে দিয়েছি—সে হিসেব আর নাইবা দিলাম তোমায়। দিনের বেলায় তোমার দেখাশোনা করে আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আমি এতই ভেঙে পড়তাম যে, মন না চাইতেই শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিতাম; কিন্তু যখনই তুমি আমার পাশ থেকে শব্দ করে উঠতে, আমি হুড়মুড় করে উঠে যেতাম। আমি দিগ্বিদিক শূন্য নয়নে তোমাকে খুঁজে নিতাম।

আস্তে আস্তে তুমি বড় হতে লাগলে। যখন তুমি হামাগুড়ি দিতে, আমি সেই দৃশ্য দেখে হেসে কুটি কুটি হতাম। যখন তুমি আমার আঙুল ধরে ধরে হাঁটতে শিখছিলে, তখন আমি মনের ভেতর কী যে এক পুলক অনুভব করতাম—তা তুমি বুঝবে না। এবং তারপর... তারপর এমন একটা দিন এলো—যা আমার জন্য সত্যিই কঠিন ছিল। এটা ছিল সেই দিন যেদিন তোমাকে প্রথম স্কুলে দিয়ে আসলাম। তোমাকে যখন স্কুলে রেখে আসছিলাম, তখন তুমি হাউমাউ করে কাঁদছিলে। এই প্রথম আমার চোখের আড়াল হলে তুমি। বিশ্বাস করো, তোমার সাথে সাথে আমিও সেদিন কেঁদেছিলাম; তবুও সেই কান্নাকে আমি বাস্তবতার উপর প্রাধান্য দিইনি। আমি জানতাম, এখানে তোমাকে পড়তেই হবে। কষ্ট হলেও থাকতেই হবে, এবং এটাই তোমার জন্য উত্তম। তোমার কল্যাণের কথা ভেবে আমি সেদিন আমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম।

এরপর, বছরগুলো দ্রুতই কেটে গেল এবং তুমি সেই স্কুলে বড় হয়ে উঠলে। পড়াশোনা শেষে তুমি স্বনির্ভর হলে। নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখলে। নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে শিখে গেলে।

এরপর... এরপর তোমার জীবনে এমন এক দিন এলো—যেদিন আমি তোমার জন্য অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম, আবার একইসাথে আমার প্রচুর দুঃখবোধও হচ্ছিল। যখন তুমি বিয়ে করার মতো কাউকে খুঁজে পেলে, তোমার খুশি দেখে আমার কী যে আনন্দ হচ্ছিল—তা লিখে বোঝাতে পারব না; কিন্তু বাবা, একইসাথে আমার অনেক খারাপও লাগছিল সেদিন। এই ভেবে, অল্প যে কয়েকটা জিনিস এতদিন আমি তোমার জন্য করতে ভালোবাসতাম, এখন থেকে সেগুলি অন্য কেউ তোমার জন্য করে দেবে। তবুও তোমাকে খুশি থাকতে দেখলে জগতে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হই। তোমার আনন্দ, তোমার ভালোলাগা আমাকে অন্যরকম শিহরণ দেয়। আমি তোমার মা! তোমাকে আমি দশটা মাস গর্ভে ধারণ করেছি। এক মৃত্যুসম ব্যথা-যন্ত্রণা আর কষ্ট নিয়ে আমি তোমাকে দুনিয়ার আলো দেখিয়েছি। বুকের দুধ খাইয়ে তোমাকে বড় করেছি। সমস্ত বিপদের সময় তোমাকে বুকে আগলে রেখেছি। পরম যত্নে। পরম মমতায়।

কিন্তু বাবা, যখন তোমার কাছে নতুন কেউ এলো, যখন তুমি সঙ্গী হিসেবে নতুন কাউকে পেয়ে গেলে, আমি তোমার কাছে কেমন যেন অবহেলার বস্তু হয়ে গেলাম। ছোট্টবেলায় খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে যখন তুমি আমার কাছে আসতে, আমি আমার আঁচল দিয়ে তোমার চোখের জল

মুছে দিতাম। বুকে জড়িয়ে ধরে ব্যথার জায়গায় মালিশ করে দিতাম। আজ যখন তুমি বড় হয়ে উঠলে, তোমার ব্যথার কথা তুমি আর আমাকে শোনাও না, কান্নাভেজা চোখে আমার কাছে ছুটে আসো না, আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমার আঁচলের মুখ লুকাও না। তোমার আনন্দের খবরগুলোও আমি আর জানতে পারি না।

বাবা, ভেবো না আমি আজ অভিযোগের ঝুলি নিয়ে বসেছি। ওয়াল্লাহি, তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি তোমার মা। পৃথিবীর কোনো মা-ই তার সন্তানের প্রতি অভিযোগ জমা রাখতে পারে না। আমিও পারিনি। শুধু চাই, তুমি ভালো থাকো। অনেক ভালো। শুভ কামনা তোমার জন্য।

সালেম!

আমার স্ত্রী যখন আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম দেয়, আমার বয়স তখন ত্রিশের কাছাকাছি। সেই রাতটির কথা আজও মনে আছে আমার।

প্রতিদিনের মতো ওই রাতটিও আমি আমার বন্ধুদের সাথে বাইরে কাটিয়েছি। এমনিতেই আমার সময়গুলো কাটত গল্পে, আড্ডায় এবং লোকজনকে উপহাস করে। মানুষকে হাসাতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আমার। অন্যদের নিয়ে আমি নিয়মিত উপহাস করতাম, ঠাট্টা-মশকরা করতাম। আমার বন্ধুরা এসব দেখে শুধুই হাসত।

মানুষকে নকল করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আমার। যে কারও স্বর নকল করে তাকে উত্যক্ত করতে পারতাম আমি। আমার এই ঠাট্টা-মশকরা থেকে আশপাশের কেউই যেন রেহাই পাচ্ছিল না। এমনকি আমার বন্ধুরাও না। একপর্যায়ে আমার ঠাট্টা থেকে বাঁচার জন্য তাদের কেউ কেউ তখন আমাকে এড়িয়ে চলা শুরু করে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে—সেই বিভীষিকাময় রাতটির কথা। মার্কেটের রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করতে থাকা এক বৃদ্ধের সাথে করা সেই ঠাট্টার কথা। সেটা ছিল খুব শোচনীয় রকমের বাড়াবাড়ি! অন্ধ ভিক্ষুকটা যখন অন্ধকার রাস্তা ধরে আসছিল, আমি তখন মজা করে তার সামনে আমার পা বসিয়ে দিয়েছিলাম। আমার পায়ের সাথে লেগে ভিক্ষুকটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে

গেল এবং চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল কে তাকে ল্যাঙ মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে; কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারল না।

আমি সেদিনও বাড়িতে ফিরলাম, সচরাচর যেরকম দেরি করে বাড়ি ফিরি। দেখলাম, আমার স্ত্রী আমার জন্য তখনো অপেক্ষা করছিল। তার অবস্থা ছিল ভয়াবহ রকম খারাপ। সে কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল, "রাশেদ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?"

"কোথায় আর থাকব? মঙ্গলগ্রহে তো আর ছিলাম না। বন্ধুদের সাথেই ছিলাম"—আমি ব্যঙ্গাত্মকভাবেই উত্তর দিলাম।

তাকে খুব বিমর্ষ লাগছিল। চেহারা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে আছে। সে কান্নাজড়িত গলায় বলল, "রাশেদ, আমি খুবই ক্লান্ত। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার মনে হয়, একটু পরেই আমাদের সন্তান পৃথিবীতে আসতে যাচ্ছে।" কথাগুলো বলতেই একফোঁটা অশ্রু তার চোখ বেয়ে বুকে গড়িয়ে পড়ল।

তার এরকম খারাপ অবস্থা দেখে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি তাকে অবহেলা করছি। আমার উচিত ছিল তার যত্ন নেওয়া। অন্তত সে যতদিন এই কঠিন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, ততদিন। এই দিনগুলো বাইরে নষ্ট করা আমার একদমই ঠিক হয়নি।

তাকে আমি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এলাম। নিয়ে আসার সাথে সাথে কর্মরত কিছু নার্স এসে তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় আমি তার প্রচণ্ড রকম চিৎকার শুনতে পেলাম। ইতোপূর্বে এরকম

অবস্থায় তাকে কখনোই দেখিনি আমি। আমি বুঝতে পারছি—তার খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে।

আজকে আমাদের প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে। আমি ভীষণ উদ্বিগ্নতা নিয়ে আমাদের অনাগত সন্তানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম; কিন্তু আমার স্ত্রীর ডেলিভারি কেইসটা খুব সহজ ছিল না। অপেক্ষা করতে করতে একটা সময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমার শরীর যেন ভেঙে আসে। হাসপাতালের বারান্দায় অপেক্ষার প্রহর গোনা আমার পক্ষে আর কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। যেসব নার্স আমার স্ত্রীর সেবায় নিয়োজিত, তাদের একজনকে আমার ফোন নাম্বার দিয়ে আমি বাসায় চলে এলাম। বলে এলাম—আমার সন্তানের সুসংবাদ যেন আমাকে সাথে সাথে জানানো হয়।

ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই আমি আমার সন্তান সালেমের জন্মের সুসংবাদ পাই। তারা ফোন করে আমাকে আমার পুত্রসন্তানের জন্য অভিবাদন জানাল। আমি তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে চলে এলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে দেখামাত্র বলল, "আপনার স্ত্রীর ডেলিভারি কেইসে যিনি দায়িত্বরত ছিলেন, আগে তাঁর সাথে দেখা করে আসুন।"

কিন্তু আমার আর একটা মুহূর্তও দেরি করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই ডাক্তারের কথা একরকম অবজ্ঞা করেই বললাম, "হোয়াট দ্য হেল ইজ দ্যাট? আমি এক্ষুনি আমার ছেলেকে দেখতে চাই।"

তারা শান্ত গলায় আবার বলল, "দেখুন, অধৈর্য হবেন না। আপনি অবশ্যই আপনার সন্তানকে দেখতে পাবেন। তবে তার আগে ডাক্তারের সাথে একটু কথা বলুন।"

লোকগুলোকে আরও কিছু অশ্রাব্য কথা শোনাতে ইচ্ছে হলো; কিন্তু কী মনে করে যেন সবকিছু ভেতরে চাপা দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলাম।

ডাক্তারের চেম্বারে এসে বসতেই তিনি আমাকে বললেন, "আপনার স্ত্রীর ডেলিভারি কেইসটা ছিল অত্যন্ত জটিল। এরকম কেইস আমরা আমাদের মেডিকেল ক্যারিয়ারে খুব কম দেখেছি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করুন এজন্যই যে, তিনি সবকিছু ভালোভাবে শেষ করিয়েছেন; কিন্তু একটা সমস্যা আছে..."

ডাক্তারের 'কিন্তু' শব্দে আমার বুকের ভেতরে 'ধপ' করে উঠল। মনে হলো, কেউ যেন ভেতর থেকে জোরে ধাক্কা দিয়েছে। আমি দ্রুত বললাম, "কী সমস্যা আমাকে খুলে বলুন।"

তিনি বললেন, "আপনার সন্তানের চোখে সমস্যা আছে। সম্ভবত সে কখনোই চোখে দেখবে না।"

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি একজন অন্ধ সন্তানের বাবা—এটা যেন কোনোভাবেই আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। কোনোরকম কান্না চেপে মাথা নিচু করে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ আমার গতরাতের সেই অন্ধ ভিক্ষুকটার কথা মনে পড়ল,

যাকে আমি রাস্তায় ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়েছিলাম মজা করার জন্য। সুবহানাল্লাহ! আপনি সত্যি তাই ফেরত পাবেন, যা আপনি অন্যদের সাথে করবেন।

অন্ধ সন্তানের বাবা আমি? আমার প্রথম সন্তানটাই অন্ধ হয়ে জন্মাল? হায়!

হঠাৎ আমার স্ত্রী আর সদ্যজাত অন্ধ সন্তানটির কথা মনে পড়ল। ডাক্তারকে তাঁর দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার স্ত্রী আর সন্তানকে দেখার জন্য তাদের নিকট চলে গেলাম।

স্ত্রীকে দেখে মোটেই বিষণ্ণ মনে হলো না। সে যেন সবকিছুকে সহজভাবে নিয়েছে। তার এই নির্ভাবনা আমাকে বেশ অবাক করেছে। এমনিতে আমার স্ত্রী খুবই আল্লাহভীরু। আমার কার্যকলাপ সে খুব অপছন্দ করত। মানুষের সাথে ঠাট্টা মশকরা না করতে আমাকে কতবার যে সে অনুরোধ করেছে, তার হিসেব নেই। বহুবার সে আমাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ব্যাপারেও সতর্ক করেছে; কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমি তার কথায় কোনোদিন কর্ণপাতও করিনি। আমি সমানতালে মানুষকে নিয়ে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-মশকরা করে গেছি।

পুত্র সালেমসহ আমরা হাসপাতাল থেকে বাসায় চলে এলাম। বাস্তবে আমি সালেমের প্রতি খুব উদাসীন ছিলাম। অন্ধ হয়ে জন্মানোতে মন থেকে আমি তাকে কোনোভাবেই আমার ছেলে হিসেবে মেনে নিতে পারিনি। মনে হতো, সে আমাদের কেউ না।

সালেম যখন জোরে জোরে কাঁদত, তখন আমি ঘুমানোর জন্য অন্য রুমে চলে যেতাম। তার প্রতি আমার অনীহা ছিল প্রচণ্ড রকম। তাকে আদর করার, ভালোবাসার কথা কখনো আমার মনেই আসত না; কিন্তু আমার স্ত্রী ছিল ব্যতিক্রম। মায়েরা সম্ভবত অন্য ধাতুতে গড়া। সন্তান যেমনই হোক, তার জন্য তাদের হৃদয়ে যেন এক অসীম ভালোবাসার খনি মজুদ থাকে। সালেমকে আমার স্ত্রী খুব ভালোবাসত। তার যত্ন করত। আমার যে ভালোবাসা থেকে সালেম বঞ্চিত ছিল, আমার স্ত্রী সেটা পুষিয়ে দেওয়ার যেন আপ্রাণ চেষ্টা করত।

সত্য বলতে, আমি সালেমকে ঘৃণা করতাম না। আবার কেন জানি তাকে আমি ভালোও বাসতে পারতাম না। কী এক অস্পষ্ট দেয়াল যেন ছিল তার আর আমার মধ্যে—আমি জানি না।

সালেম আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। সে হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। যখন তার বয়স এক বছর, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, সালেম আসলে প্রতিবন্ধী। এটা জানার পরে আমি দ্বিতীয়বারের মতো ধাক্কা খেলাম। সালেমকে এমনিতেই আমি ভালোবাসতাম না। যখন জানলাম সে একজন প্রতিবন্ধী, তখন থেকেই তাকে আমি বোঝা মনে করতে লাগলাম—একটা উটকো ঝামেলার মতো।

সালেমের পর আমাদের কোলজুড়ে আরও দুটো সন্তান আসে—উমার এবং খালেদ।

দিনগুলো এভাবেই পার হচ্ছিল। সালেম বড় হচ্ছে, সাথে উমার এবং খালেদও। বাসায় থাকতে আমার একদম ভালো লাগত না। আমি আগের মতোই বেশিরভাগ সময় বন্ধুদের সাথে বাইরে বাইরে কাটাতাম।

আমার এরকম আচরণ সত্ত্বেও আমার স্ত্রী কখনোই আমার উপর থেকে আশা ছেড়ে দেয়নি। সে সবসময় আমার হিদায়াতের জন্য দুআ করত। আমার এহেন আচরণে সে কখনোই রাগ করত না; কিন্তু সে মনে মনে খুব কষ্ট পেত, যখন সে দেখত—আমি পুত্র সালেমকে অবহেলা করে অন্য দুজনকে ঠিকই আদর করছি।

সালেম বড় হচ্ছিল, আর সাথে বাড়ছিল আমার দুশ্চিন্তাও। এই প্রতিবন্ধীটাকে নিয়ে আমি কী করব? আমার স্ত্রী যখন তাকে একটি ভালো প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে বলল, আমি আপত্তি জানাইনি। যাক, অন্তত বোঝাটা অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হোক।

এভাবে কতগুলো বছর যে চলে গেল, আমি বুঝতেই পারলাম না। আমার দিনগুলো ছিল আগের মতোই। খাওয়া-কাজ-আড্ডা-ঘুম। এভাবেই।

এক শুক্রবার। আমি বেলা এগারোটায় ঘুম থেকে উঠলাম। বলা চলে, প্রতিদিনের তুলনায় সেদিন আমি অনেক ভোরেই জেগেছি। কারণ, আমার এক জায়গায় দাওয়াত ছিল। আমি কাপড় পরে, গায়ে পারফিউম মেখে বের হতে যাচ্ছিলাম।

যখন আমি আমাদের বেডরুম অতিক্রম করছিলাম, আমি দেখলাম সালেম হুইল চেয়ারে বসে একা একা কাঁদছে।

তার জন্মের পর এই প্রথমবার নিজ চোখে তাকে আমি কাঁদতে দেখছি। দশ বছর কেটে গেল, কিন্তু এই দশ বছরে একটিবারের জন্যও আমি তার প্রতি নজর দিইনি। একটু ভালোবাসার চোখে তাকাইনি। একটু ভরসার স্পর্শে তার হাত ধরিনি। আজকেও তাকে আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেন যেন পারলাম না। আমি শুনলাম, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর তার মাকে ডাকছে।

আমি এই প্রথমবারের মতো তার কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, "সালেম, তুমি কাঁদছ কেন?"

আমার কণ্ঠ শোনামাত্র সে কান্না থামিয়ে দিল। আমাকে তার এত কাছে পেয়ে সে তার ছোট ছোট হাত দুটি হাতড়িয়ে আমাকে অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি খেয়াল করলাম, সে আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। যেন সে ঘৃণাভরে আমাকে বলতে চাচ্ছে, 'এতদিনে আমাকে তোমার মনে পড়ল? এই দশ বছর কোথায় ছিলে তুমি?'

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। দেখলাম, সে হুইল চেয়ারে ভর করে সাবধানে তার রুমের দিকে চলে গেল। আবার জানতে চাইলাম, কেন সে কাঁদছে। প্রথমে সে তার কান্নার কারণ আমাকে বলতে চায়নি। আমি তার সাথে শান্তভাবে কথা বলতে লাগলাম। এরপর সে আমাকে তার কান্নার কারণ খুলে বলল। সে যখন আমাকে তার কান্নার কারণ বলছিল, আমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আর কাঁপছিলাম।

বলতে পারেন কী ছিল সেই কারণ?

তার ছোট ভাই 'উমার, যে তাকে ধরে ধরে প্রতিদিন মাসজিদে নিয়ে যায়, সে এখনো তাকে মাসজিদে নিতে আসেনি। সালেমের ভয় হচ্ছিল, না জানি আবার মাসজিদে যেতে তার দেরি হয়ে যায় আর সে মাসজিদের সামনের কাতারে বসার জায়গা না পায়। তাই সে 'উমার আর তার মা'কে চিৎকার করে ডাকছিল; কিন্তু তারা কেউই সাড়া দিচ্ছে না দেখে সে কাঁদতে শুরু করল।

সালেমের কাছে কথাগুলো শুনে আমি তার পায়ের কাছে বসে গেলাম। দেখলাম, তখনো সালেমের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

তার পরের কথাগুলো আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি আমার হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিতে দিতে বললাম, 'এই জন্যেই কি তুমি কাঁদছিলে, সালেম?'

—'জি' সে বলল।

মুহূর্তের মধ্যেই আমি আমার বন্ধুদের কথা ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম দাওয়াতের কথা। আমি বললাম, 'সালেম, কেঁদো না। তুমি কি জানো, আজ কে তোমাকে মাসজিদে নিয়ে যাচ্ছে?' সালেম বলল, 'জানি, 'উমার; কিন্তু সে সবসময় দেরি করে আসে।'

—'না সালেম। 'উমার নয়, আজ আমিই তোমাকে মাসজিদে নিয়ে যাব।' আমি বললাম।

আমার কথায় সালেম যেন খুব অবাক হলো। সে কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমি হাত দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দিলাম। আমার হাত তার হাতের উপর রাখলাম। আমি তাকে আমার গাড়িতে করে মাসজিদে নিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু সে আপত্তি জানাল। সে গাড়িতে করে যেতে চাইল না। বলল, 'মাসজিদ খুব কাছেই। আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাও।'

শেষ কবে যে আমি মাসজিদে ঢুকেছিলাম আমার মনে নেই; কিন্তু এত বছর ধরে যত পাপ আমি করেছি, তার জন্যে এই প্রথম আমার মনের ভেতর একটা চাপা ভয় এবং অনুতাপ অনুভব করলাম।

পুরো মাসজিদ ছিল মুসল্লিতে ভরপুর; কিন্তু তবুও দেখলাম, একদম সামনের কাতারে সালেমের জন্য একটা খালি জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারলাম, মাসজিদে সালেম মুসল্লি হিসেবে খুব পরিচিত।

আমরা একসাথে জুমুআর খুতবা শুনলাম। সালেম আমার পরে পরে রুকু-সিজদায় যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, আমিই তার পরে পরে রুকু-সিজদা করছি।

সালাতের পর সে আমাকে একটি কুরআন এনে দিতে বলল। তার কথা শুনে আমি অবাক হলাম। সে তো অন্ধ। সে কী করে কুরআন তিলাওয়াত করবে?

আমি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে চাইলাম, কিন্তু তার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে—সেরকম কিছু করা তখন আমার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। আমি তাকে একটি কুরআন এনে দিলাম।

সে আমাকে বলল, কুরআন থেকে সূরা কাহাফ বের করে দিতে। আমি কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলাম আর সূচিপত্র দেখে সূরা কাহাফ খুঁজতে লাগলাম।

সে আমার হাত থেকে কুরআনটি নিয়ে নিল। সেটি মুখের সামনে ধরল আর সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করতে লাগল।

ইয়া আল্লাহ, পুরো সূরা কাহাফ তার মুখস্থ!! আমি যেন এই দৃশ্য কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি নিজেই নিজের প্রতি লজ্জিত হলাম। এই অন্ধ সন্তানের কাছে আমি কতই না তুচ্ছ! আমিও একটি কুরআন হাতে নিলাম। তখনো আমার পুরো শরীর কাঁপছিল। আমি কুরআন তিলাওয়াত করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি। আমি আল্লাহর কাছে বার বার মাফ চাইছিলাম আর বলছিলাম, 'হে আল্লাহ, আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখাও! হে আল্লাহ, আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখাও!'

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। মুহূর্তেই শিশুদের মতো কান্না শুরু করলাম।

মাসজিদে তখনো কিছু মুসল্লি অবশিষ্ট ছিল যারা সুন্নত আদায় করছিল। আমি লজ্জিত হলাম। তাই আমি কোনোরকমে আমার কান্না চেপে যেতে

চাইলাম। আমার চাপা কান্না দীর্ঘায়িত হলো আর শরীর খুব কাঁপছিল। আমি তখন খেয়াল করলাম, একটি ছোট্ট হাত আমার মুখমণ্ডল স্পর্শ করছে আর আমার চোখের জল মুছে দিচ্ছে। এটা ছিল আমার পুত্র সালেম। আমার অন্ধ পুত্র সালেম। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'সালেম, তুমি অন্ধ নও। তুমি অন্ধ হতেই পার না। অন্ধ তো আমি, চোখ থাকা সত্ত্বেও যে তার হীরের টুকরো ছেলেকে চিনতে পারেনি।'

আমরা বাপ-বেটা বাড়ি চলে এলাম। ততক্ষণে আমার স্ত্রী সালেমের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল; কিন্তু তার উদ্বিগ্নতা আনন্দাশ্রুতে পরিণত হলো, যখন সে জানতে পারল, সালেমের সাথে আমিও আজকে জুমুআ আদায় করেছি।

সেদিন থেকে আমি আর এক ওয়াক্ত সালাতও ছাড়িনি। আমি আমার খারাপ বন্ধুগুলোকেও ত্যাগ করেছি এবং মাসজিদে নিয়মিত সালাত আদায় করে এরকম কিছু মানুষকে বন্ধু করে নিয়েছি।

তাদের সাথে মিশতে মিশতে আমি ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। তাদের কাছ থেকে আমি এমন কিছু শিখছিলাম—যা আমাকে মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে ভাবাতে লাগল।

আমি কোনো ধর্মীয় বক্তৃতা মিস করতাম না। প্রায়ই আমি পুরো কুরআন তিলাওয়াত করে ফেলতাম। অনেক সময় সেটা এক মাসের মধ্যেই। আমি সবসময় আল্লাহর স্মরণে থাকতাম। ভাবতাম, তিনি অবশ্যই আমার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আমি আমার পরিবারের দিকে মন দিলাম। আমার স্ত্রীর চোখে-মুখে সবসময় যে ভয়ের রেখা দেখা যেত, সেটি আর

নেই। একটুকরো হাসি আমার ছেলে সালেমের মুখে লেগেই থাকত। যে কেউ তার এই হাসি দেখত, তারা বুঝতে পারত সে সম্ভবত দুনিয়ার সবকিছুই অর্জন করে ফেলেছে। আল্লাহর এই বিশেষ রাহমাতের জন্য আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করলাম।

একদিন আমার ঈমানী বন্ধুরা মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কিছু দূরে যাওয়ার নিয়ত করল। আমি যাব কি যাব না, এটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছিলাম। আমি ইস্তিখারা করছিলাম আর আমার স্ত্রীর সাথে এই বিষয়ে পরামর্শ করছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম, সে আমাকে যেতে নিষেধ করবে। কিন্তু হলো তার উল্টোটি। এটা শুনে সে খুবই খুশি হলো এবং আমাকে যেতে বেশ উৎসাহ দিল। কারণ, সে ইতোপূর্বে কখনো কোথাও যাওয়ার আগে আমাকে তার সাথে পরামর্শ করতে দেখেনি।

আমি সালেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, আমাকে কিছু দিনের জন্য দাওয়াতি কাজে বেরোতে হবে। সে অশ্রুসজল চোখে আমার দিকে তার দুই বাহু প্রসারিত করে দিল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে নিলাম। তার কপালে, গা লে চুমু খেলাম। স্ত্রী, খালেদ, 'উমার আর সালেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম দা'ওয়াতি কাজে।

প্রায় সাড়ে তিন মাসের মতো আমি বাইরে ছিলাম। সেই সময়টাও যখনই সুযোগ পেতাম, ফোনে আমার স্ত্রী আর সন্তানদের সাথে কথা বলতাম। আমি তাদের অনেক মিস করতাম। বিশেষ করে সালেমকে। আমি তার

কণ্ঠ শোনার জন্য ব্যাকুল ছিলাম; কিন্তু আমি চলে আসার পর থেকে সবার সাথে কথা হলেও, তার সাথে আমার কোনো কথা হয়নি।

আমি যখনই বাড়িতে ফোন করতাম, তখন সে হয় স্কুলে থাকত, নয়তো মাসজিদে। যখনই আমি আমার স্ত্রীকে বলতাম যে, সালেমকে আমি কতটা মিস করছি, তখন সে আনন্দে আর গর্বে হাসত। শুধু শেষবার যখন ফোনে তাকে সালেমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি, সেবার তাকে আগের মতো উৎফুল্ল মনে হয়নি। তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন বদলে গেল। আমি বললাম, 'সালেমকে আমার সালাম দিয়ো।'

সে শুধু বলল, 'ইন শা আল্লাহ!' এরপর চুপ করে গেল।

এর কিছুদিন পর আমি বাড়ি এলাম। দরজায় আওয়াজ করলাম। আমি ভেবেছিলাম, সালেমই আমার জন্য দরজা খুলে দেবে; কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে খালেদ সেবার দরজা খুলে দিল—যার বয়স ছিল চার বছরের মতো। খালেদ আমাকে 'বাবা বাবা' বলে ডাকতে শুরু করল। আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম। আদর করলাম; কিন্তু কেন জানি না, যখন থেকে ঘরে ঢুকলাম, তখন থেকেই আমার মনের ভেতর একটা ভয় কাজ করছিল। এক অদ্ভুত রকমের চাপা ভয়!

আমি শাইতানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইলাম। আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে গেলাম। তার চেহারা আগের মতো সতেজ নেই। জগতের সকল দুঃখ যেন তার চেহারায় এসে ভর করেছে। আমাকে দেখে সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল এবং 'সে ভালো আছে' এরকম অভিনয় করতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, 'কী হয়েছে তোমার?'

—"কিছুই না।" সে জবাব দিল।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'সালেম কোথায়?'

সে কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে ফেলল। তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। চিৎকার করে বললাম, 'সালেম কোথায়? সালেম?'

তখন আমার চার বছরের ছেলে খালেদ তার অস্পষ্ট স্বরে বলল, "বাবা, সালেম ভাইয়া জান্নাতে চলে গেছে। আল্লাহর কাছে।"

আমার স্ত্রী এটা সহ্য করতে পারল না। সে কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত রুম ছেড়ে চলে গেল।

পরে জানতে পারলাম, আমি যাওয়ার দুই সপ্তাহ পর সালেম জ্বরে আক্রান্ত হয়। আমার স্ত্রী তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়; কিন্তু সে আর সেরে ওঠেনি। জ্বরের উসিলায় সে আল্লাহর সাক্ষাতে চলে গেছে।

বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসুন

সমুদ্রের পাড়ে একটা ত্রিকোণা চাদরের ওপর বসে আছেন এক বৃদ্ধা। দূরে উপচে পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। সূর্যাস্ত দেখছেন। দেখছেন সাগরের ঢেউয়ের ওপর বেলা শেষের আলোর খেলা। না জানি, কত হৃদয়ভাঙা কাহিনি, কত অবিস্মরণীয় ঘটনা, কত মন-ভোলানো স্মৃতি এই সাগরের অতলে চাপা পড়ে আছে। তার নিজের জীবনটাও যেন অনেকটা সাগরের মতোই।

সৈকতে সেদিন অনেক পরিবারই বেড়াতে এসেছিল। বৃদ্ধার কাছেই বসেছিল এমন একটি পরিবার। ছোটরা চারপাশে খেলা করছে। বড়রা উচ্ছ্বসিত গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, চা খাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে—অনেক দিন পরে পরিবারের সবাই একসাথে হয়েছে। রাত গভীর হতে হতে প্রায় একটা বাজল। বাড়ি ফেরার জন্য গোছগাছ প্রায় শেষ। সৈকত ছেড়ে যাওয়ার আগে বেড়াতে আসা পরিবার থেকে মাঝবয়সী একজন লোক বেরিয়ে এলো। বৃদ্ধা তখনো একাকী বসে ছিলেন। চোখ সাগরের উপচে পড়া ঢেউয়ের দিকে স্থির। লোকটি বৃদ্ধার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'খালাম্মা, আপনি কি কারও জন্য অপেক্ষা করছেন? সেই সন্ধ্যা থেকেই দেখছি এখানে একা একা বসে আছেন। অনুমতি দিলে আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।'

বৃদ্ধা বললেন: ‘না বাবা, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি আসলে আমার ছেলের জন্য অপেক্ষা করছি। সে দ্রুতই চলে আসবে। সম্ভবত রাস্তায় খুব জ্যাম। এজন্যই হয়তোবা দেরি হচ্ছে।’

—“রাত প্রায় দেড়টা বাজে। এ সময় কে আসবে?”—লোকটা জিজ্ঞেস করল।

বৃদ্ধা বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ বাবা; কিন্তু আমি আমার ছেলের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী করতে পারি বলো? এই চিঠিটাই দেখো। আমার ছেলে এখানে রেখে যাওয়ার সময় আমার হাতে দিয়ে গেছে; কিন্তু আমি তো পড়তে পারি না। তুমি একটু পড়ে দেখবে বাবা?”—এই বলে বৃদ্ধা ছেলের রেখে যাওয়া একটা ছোট চিরকুট লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক সেটি পড়তে শুরু করলেন—

‘এই চিরকুট যিনি পড়বেন তাকে অনুরোধ করছি, যেন তিনি চিরকুট বহনকারী বৃদ্ধাকে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসেন।’

চিঠিখানা পড়ে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন। পৃথিবী যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সাগরের গর্জন থেমে গেছে। ঢেউগুলোও মনে হচ্ছে আর পাড় ভাঙছে না। সবখানে যেন একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে এই মুহূর্তে। নির্বাক ভদ্রলোক চিঠিটা নিয়ে নিজের পরিবারের কাছে ফিরে এলেন। তাঁর পরিবারের একে একে সবাই এই চিঠিটা পড়লেন এবং পড়া শেষে কেউই নিজের চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। এরকম হতভাগা বৃদ্ধা মায়ের জন্য সবার প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে গেল। এই

চিঠি যে পাষণ্ড লিখেছে তাকে তার মা গর্ভে ধারণ করেছেন নয় মাস। দু'বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করিয়েছেন। কত রাত তিনি নির্ঘুম কাটিয়েছেন—যেন সন্তান আরামে ঘুমাতে পারে। এত কিছুর প্রতিদানে পেলেন একটা পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ সন্তান। একটা কুকুরও তার বৃদ্ধ অসহায় মনিবকে একা ফেলে চলে যায় না। কুকুরও এতটা অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন হয় না, কিন্তু মানুষ কীভাবে হয়!

এই ঋণ শোধ হবার নয়

ছেলেটি খুবই ধার্মিক। সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের গুরুত্ব সে বুঝত এবং সেভাবেই সে পিতা-মাতার সাথে আচরণ করত। বলা চলে, বাবা-মায়ের প্রতি তার আচরণ ছিল অন্যদের জন্য আদর্শস্বরূপ। ফলে মানুষের মুখে মুখে তার উত্তম আচরণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই ভালো কাজটি তার মধ্যে অহংকারের জন্ম দেয়। সে নিজেকে অনেক বড় আল্লাহভক্ত, পিতা-মাতার অনুগত, বাধ্য ভাবতে শুরু করল এবং আরও মনে করতে লাগল যে, পিতা-মাতার জন্য যে হক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্ধারণ করেছেন, তার সবটাই সে আদায় করে ফেলেছে।

একদিন সে তার বাবাকে বলল, ‘বাবা, শৈশবে আমার প্রতি আপনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন। তাই প্রতিদানে আমিও আপনার সাথে ভালো আচরণ করতে চাই। তাছাড়া আল্লাহর জন্যই আমি আপনার সাথে সদাচারণ করি, আপনার কঠিন আদেশ পালনেও তৎপর থাকি। আপনার আদেশকে আমি নিজের জন্য সহজ ও উপভোগ্য করে নিই।’

ছেলেটির বাবা ছিলেন একজন বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ মানুষ। তিনি মনোযোগ দিয়ে ছেলের কথা শুনলেন; কিন্তু ছেলের অনুভূতিতে আঘাত লাগে—এমন একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করলেন না। তিনি বললেন, ‘বাবা আমার, তুমি আমার সাথে সদাচরণ করছ, আমার দেখভাল করছ এজন্য আল্লাহর দরবারে অনেক শুকরিয়া। প্রিয় পুত্র, জীবনে আমার তেমন কোনো শখ আহ্লাদ নেই; শুধু একটি ইচ্ছে বাকী আছে। তুমি কি শুনতে চাও, কী সেই ইচ্ছে?’

ছেলেটি বলল, ‘অবশ্যই, দয়া করে আপনার সেই ইচ্ছেটার কথা আমাকে বলুন। আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও তা পূরণ করব, ইন শা আল্লাহ্।’

বাবা বললেন, ‘আমার খুব আপেল খেতে ইচ্ছে করছে। পারবে এনে দিতে?’

কঠিন কোনো দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য ছেলেটি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিল; কিন্তু এ কী, বাবার ইচ্ছে সামান্য আপেল খাওয়া!

সে বলল, ‘বাবা, এটা তো খুবই সহজ কাজ। আমি ভেবেছিলাম, আপনি হয়তোবা কঠিন কোনো দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করবেন।’

বাবা হাসিমুখে বললেন, ‘না, এটাই আমার শেষ ইচ্ছে বলতে পার।’

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ অনেকগুলো আপেল নিয়ে এসে বলল, ‘বাবা, এই যে আপেল; আপনি এখান থেকে যতগুলো ইচ্ছে খান। শেষ হয়ে গেলে আরও এনে দেবো। আপনার আদেশ পালনে আমি বাধ্য।’

বাবা বললেন, ‘না না। এগুলোই যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নেই; তবে এই আপেলগুলো এখানে বসে খেতে ইচ্ছে করছে না। ওই যে সামনের পাহাড়টি দেখছ, আমি তার চূড়ায় উঠে এই আপেলগুলো খাবো। সুতরাং তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার প্রতি সদয় হয়ে থাকো, আমাকে পাহাড়টার চূড়ায় নিয়ে চলো।’

বাবার এমন অদ্ভুত আবদারে ছেলেটি বেশ অবাকই হলো; তবুও সে বাবাকে খুশি করার জন্য তার আদেশ পালন করল। এক হাতে আপেলের ঝুড়ি আর পিঠে বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। বাবাকে একটা জায়গায় বসিয়ে আপেলগুলো তার সামনে রাখল। এরপর বিনয়ের সাথে আপেলগুলো খাওয়ার জন্য বাবাকে অনুরোধ করল; কিন্তু তিনি ঝুড়ি থেকে একটি একটি করে আপেল নিয়ে সেগুলো পাহাড়ের ঢালের দিকে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন। অতঃপর ঝুড়িটি সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলে বাবা ছেলেকে বললেন, ‘যাও, নিচ থেকে আপেলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসো।’

বাবা ঠিক কী চাচ্ছেন, ছেলেটা এর কিছুই বুঝতে পারল না। বাবা আবার বললেন, ‘কই, যাও নিচে। কুড়িয়ে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।’

সন্তান আদেশ পালন করল। আপেলগুলো নিচ থেকে কুড়িয়ে এনে বাবার হাতে দিল। বাবা আপেলগুলো হাতে নিয়ে একটু পর আবার আপেলগুলো পাহাড় থেকে নিচে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন। ছেলেটি অবাক হলো। বাবা বললেন, ‘যাও, আপেলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসো।’

ছেলেটি আবার নিচে নামল এবং আপেলগুলো কুড়িয়ে বাবার কাছে এনে দিল। এবারও বৃদ্ধ বাবা আপেলগুলো হাতে নিয়ে নিচে ছুড়ে মারলেন এবং আদেশ করলেন আপেলগুলো কুড়িয়ে আনতে। এবার ছেলেটি কিছুটা বিরক্ত হলো; কিন্তু রাগ সংবরণ করে সে এবারও নিচ থেকে আপেলগুলো কুড়িয়ে এনে বাবাকে দিল।

আপেলগুলো হাতে পেয়ে চতুর্থবারও বাবা আপেলগুলো নিচে ছুড়তে লাগল। এবার ছেলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তার চেহারায় প্রচণ্ড রাগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাবা ছেলের এরকম চেহারা দেখে তার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি আলতোভাবে সন্তানের কাঁধের উপর তার হাত রেখে বললেন, 'আমার সন্তান, রাগ করো না। এটাই সেই জায়গা। শৈশবে তুমি বার বার তোমার খেলার বলকে এই পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে ফেলতে। আর আমি কী করতাম জানো? বার বার সেটাকে কুড়িয়ে এনে তোমার ছোট্ট হাতে তুলে দিতাম। তোমার সেই আচরণ কখনো আমাকে বিন্দু পরিমাণ বিরক্ত বা ক্লান্ত করেনি; বরং এভাবে খেলা করে তুমি মজা পেতে দেখে আমারও খুব ভালো লাগত। তোমাকে খুশি করার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি ছিলাম।' অথচ প্রায় একই কাজ তোমাকে কতটা রাগান্বিত করল!

হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রতি পিতা-মাতার অবদান অতুলনীয়। আমরা তাদের জন্য যত কিছুই করি না কেন; তাদের ঋণ কখনো শোধ হবার নয়। তাই আমাদের উচিত, যথাসাধ্য তাদের

সম্মান করা, সেবাযত্ন করা, এবং ভালোবাসা। তাদের জন্য দু'আ করা, ক্ষমা চাওয়া এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের নেক আমলকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা। [১]

[১] সা'আদাতুদ দারাইন ফি বিররিল-ওয়ালিদাইন।

উপহার

শৈশবেই ছেলেটির মা মারা যান। ছোট্ট ছেলেটির প্রতিপালনের সকল দায়িত্ব এসে পড়ে বাবার ওপর। বাবা ছিলেন একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। ছেলেকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ছেলে যেন নষ্ট হয়ে না যায়, তাই ব্যস্ততার মাঝেও ছেলেকে তিনি সাধ্যমতো সময় দিতেন।

দেখতে দেখতে ছেলেটি বড় হয়ে ওঠে। একদিন সে বাবার কাছে একটা দামি গাড়ির আবদার করে বসল।

বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। এবার যদি তুমি পরীক্ষায় ভালো করো, তাহলে তোমাকে একটা নতুন মডেলের দামি গাড়ি কিনে দেবো, ইন শা আল্লাহ।'

বাবার কথায় ছেলেটি খুবই অনুপ্রাণিত হলো। সে খুব ভালোমতো পড়াশোনা শুরু করল। সে জানে, বাবা যখন ও'য়াদা করেছেন, তখন তিনি তার ও'য়াদা রাখবেনই। তাই ভালো ফলাফল করার জন্য ছেলেটি আগের চেয়েও কয়েকগুণ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা শুরু করল। যেদিন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো, দেখা গেল, সে ক্লাসের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এবার বাবা নিশ্চয়ই তাকে গাড়ি কিনে দেবেন। বাড়ি ফিরে সে বাবাকে তার সার্টিফিকেট দেখাল। বাবাও অত্যন্ত খুশি হলেন। পরদিন একটা বাক্স এনে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার কলিজার টুকরা, এই নাও তোমার উপহার।'

খুশিতে ছেলেটি চিৎকার দিয়ে বাক্সটি হাতে নিল, বাক্সের মধ্যে নিশ্চয়ই গাড়ির চাবি রাখা আছে; কিন্তু যখন বাক্সটি খুলল, দেখল ভেতরে একটি কুর'আনের কপি।

সে খুব অবাক হলো। তার মেজাজ চড়ে গেল। টেবিলের উপর বাক্সটা সশব্দে রেখে তার বাবাকে বলল, ‘তুমি আমাকে গাড়ি কিনে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করোনি? পরীক্ষায় ভালো করার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি। আর এখন কিনা তুমি আমাকে গাড়ির বদলে একটি কুর'আন দিচ্ছ? তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ...’

বাবা ছেলেকে কিছু একটা বলতে চাইলেন; কিন্তু ছেলে বাবার কোনো কথা না শুনে আবারও চটে গেল। বাবার সাথে খারাপ আচরণ করতে লাগল। বাবা নির্বাক হয়ে গেলেন। বুঝতে পারছিলেন না, তার করণীয় কী। ছেলেটি ইতোমধ্যে বাড়ি থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়েও গেল। এক পর্যায়ে, বাবাও দেখতে চাইলেন—ছেলের আচরণ কোথায় গিয়ে ঠেকে। তাই ইচ্ছে করেই ছেলেকে আর বাধা দেননি তিনি।

অতঃপর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এলো। ছেলে তখনো বাড়ি ফেরেনি। ইতোপূর্বে সে কখনোই এমনটি করেনি। রাগ করে এর আগেও সে বাসা থেকে বের হয়েছে, আবার ঠিকই সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরেছে। ছেলের কথা ভেবে বাবা খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি চারদিকে ছেলের খোঁজ করতে লাগলেন। সকল আত্মীয়স্বজনদের কাছে খোঁজ নেওয়া হলো। হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন কোনোটাই বাদ নেই; কিন্তু ছেলেকে কোথাও

পাওয়া গেল না। বাবার চোখেমুখে শুধুই বিষণ্ণতা আর অনুশোচনা। এমনি করেই কেটে যেতে লাগল এক একটি দিন, সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছর।

অন্যদিকে, বাবার ওপর অভিমান করে ছেলেটি দূরের একটি শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করল। সে বাড়ির কথা মোটেও চিন্তা করত না। বাবাকে দেখার ইচ্ছেও তার হয়নি কখনো। সে ভাবত, বাবা ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। মহাপাপ করেছেন। তার মনে হতো, তাকে তিনি পছন্দ করেন না। এভাবেই প্রায় বিশটি বছর কেটে গেল।

একদিন হঠাৎ করেই বাড়ি ফেরার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এতদিন পরে হলেও বাবার কথা ভীষণ মনে পড়ছে। কেন জানি মনে হচ্ছে—কোথাও একটা ভুল হয়েছে তার। দ্রুত নিজের শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। শহরে পৌঁছে সে জানতে পারল, তার বাবা তার জন্য দুশ্চিন্তা করতে করতেই মারা গেছেন। তার ঘরবাড়ি, সহায় সম্পত্তি সব সেভাবেই পড়ে আছে। বাবা নেই ভাবতেই তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হলো।

সে তার ছোটবেলার ঘরটিতে গেল। অনেকদিন সে ঘরে কেউ পা রাখেনি। সবকিছুতে ধুলা পড়ে আছে। সে একটু একটু করে ঘরটা পরিষ্কার করল। বাবার কাগজপত্রগুলো সব জড়ো করতে গিয়ে হঠাৎ বিশ বছর আগের সেই বাক্সটি তার চোখে পড়ল। বাক্সটি হাতে তুলে নিল সে। খুলে দেখল, এখনো ভেতরে কুর'আনটি সেভাবেই আছে। ভালোভাবে খেয়াল করতে গিয়ে তার নজরে পড়ল পাশে রাখা ছোট্ট চাবিটি। এটাই কি সেই গাড়ির চাবি যা সে বাবার কাছে চেয়েছিল? তার মনে পড়ল, বাবা কিছু বলতে চাচ্ছিলেন

সেদিন। এই চাবির কথাই কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি? তার ভীষণ খারাপ লাগা শুরু হলো। বুঝতে পারল, খুব বড় একটা ভুল হয়ে গেছে তার জীবনে। খুব সাংঘাতিক একটা ভুল। মুহূর্তেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ভীষণ কষ্টে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে কাঁদতে; কিন্তু তার মুখ থেকে একটি শব্দও বের হলো না।

আসলে, সন্তানেরা অনেক সময়ই বাবা-মা'কে ভুল বুঝে তাদের আঘাত দেয়; কিন্তু সব বাবা-মা-ই সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। সবসময়ই তারা সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। সত্যি বলতে, আমাদের পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণই কেবল আমাদের সফলতায় সত্যিকারভাবে খুশি হন।

মায়ের চোখে পৃথিবী

আমার মায়ের একটি চোখ নষ্ট। তার ব্যাপারে এটাই ছিল আমার অস্বস্তির প্রধান কারণ। তিনি আমার সাথে থাকলে সবাই জানতে চাইত, তিনি আমার মা কি না। তখন আমার এত লজ্জা লাগত যে, কী উত্তর দেব বুঝতে পারতাম না।

সংসার চালানোর জন্য মাকে একটি প্রাথমিক স্কুলে রান্না করতে হতো। একদিন শিক্ষকদের কাছ থেকে আমার লেখাপড়ার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তিনি ক্লাসে আসেন। যখন তিনি স্যারের সাথে কথা বলছিলেন, লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে তাঁকে গালমন্দ করছিলাম আর অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

পরদিন স্কুলে গেলে আমার এক সহপাঠী এসে বলল, ‘গতকাল একচোখ কানা যে মহিলা বাবুর্চি এসেছিল, সে কি তোর মা?’

একথা শুনে লজ্জায় আমি মরেই যাচ্ছিলাম। মেজাজ খারাপ করে বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, ‘তুমি নিজের এই বিদঘুটে চেহারা দেখিয়ে আমাকে সবার সামনে অপদস্থ করেছ। দয়া করে জাহান্নামে গিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। তোমার মতো একচোখা কানা মা থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভালো।’

সেদিন তাঁকে অনেক অপমান করেছিলাম; কিন্তু তিনি একটি কথারও জবাব দেননি। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন আমার কথাগুলো। আমার কথা শেষ হলে তিনি খুব নম্রভাবে আমার সামনে থেকে চলে যান। এরকম উদ্ধত

আচরণের জন্যও সেদিন আমি অনুতপ্ত হইনি। কেন জানি, তাঁকে দেখলেই আমার বিরক্তি লাগত। আমার কথায় সে আঘাত পেল কি না, তা কখনো ভেবে দেখার ইচ্ছেও হয়নি আমার। আমি শুধু নিজের কথাই চিন্তা করতাম। ভাবতাম, পড়ালেখা শেষ করে একটা চাকরি পেলে তাকে ফেলে দূরে কোথাও চলে যাব। নিজে একা একা অনেক সুখে শান্তিতে থাকব; কিন্তু এত অপমানের পরও মা সবসময় আমাকে নিয়ে এবং আমার পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা করতেন।

কঠোর পরিশ্রম করে একটা পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অর্জন করি। সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য বৃত্তিও পেয়ে যাই। সেখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে কয়েক বছর পর আবার দেশে ফিরে আসি। ভালো একটা চাকরি পাই। বিয়ে করি। আর, বিশাল একটি বাড়ি কিনে সেখানেই সুখে শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছিলাম। মায়ের কথা কখনো চিন্তাও করিনি। তাছাড়া তাঁকে দেখারও কোনো ইচ্ছে হয়নি কখনো। আমার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে দেখা করার জন্যও কখনো আসতে বলিনি তাঁকে। এমনকি আমার সন্তানরা জানতও না যে, তাদের দাদি জীবিত আছেন।

আমার মা-ও অনেক দিন আমার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেননি। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি তাঁকে ঘৃণা করি। তাঁকে মোটেও পছন্দ করি না; কিন্তু মায়ের মনে সবসময়ই সন্তানের জন্য একটা টান থাকে। একদিন ঠিকানা জোগাড় করে তিনি ঠিকই আমার বাড়িতে চলে

এলেন। বাড়ির দরজায় আসামাত্র আমার সন্তানরা আমার অন্ধ মাকে দেখে হাসতে শুরু করল।

আমি বেরিয়ে তাঁকে দেখতে পেয়ে খুব অপমান করলাম। বললাম, 'কী আশ্চর্য! তুমি আমার বাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছ? সারাজীবন তোমার জন্য আমি লাঞ্ছিত হয়েছি, অপমান সহ্য করেছি। এখন একটু সুখে শান্তিতে আছি, তাও কি তোমার সহ্য হচ্ছে না? তুমি কি তোমার কুৎসিত চেহারা দেখিয়ে আমার সন্তানদের ভয় দেখাতে এসেছ?'

তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি, বাবা। ভুলে রাস্তা হারিয়ে এখানে চলে এসেছি। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।' এই বলে তিনি আর অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করলেন। বয়সের ভারে ভেঙে পড়া শরীর নিয়ে তাঁর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। তবুও, তাঁর সেই কষ্ট আমার ভেতরে একটুও আলোড়ন সৃষ্টি করেনি সেদিন।

একদিন স্কুল থেকে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনীর নিমন্ত্রণ পেলাম। আমার জানামতে, মা তখনো স্কুলের বাবুর্চি হিসেবে কাজ করতেন। স্ত্রীর কাছে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা বলে স্কুলের পুনর্মিলনীতে চলে এলাম। কৌতূহলবশত আমার আগের প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করে পুরাতন বাড়ির খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছে জাগল মনে। তবুও মাকে দেখার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। বাড়ি গিয়ে যখন প্রতিবেশীদের মুখে শুনলাম মা মারা গেছেন, আমি মোটেও দুঃখিত হইনি। একফোঁটা চোখের পানিও পড়েনি আমার। এক প্রতিবেশী এসে বলল, মা নাকি মারা যাবার আগে আমার

জন্য একটা চিঠি রেখে গেছেন। প্রতিবেশী আমার হাতে চিঠিটা দিলে আমার খুলে পড়ার কোনো ইচ্ছেই জাগছিল না। কী আর লিখবে বুড়িটা? সম্ভবত আমাকে আচ্ছামতো অভিশাপ দিয়েছে; কিন্তু কী মনে করে যেন চিঠিটা খুলে ফেললাম এবং পড়তেও শুরু করলাম:

'প্রিয় পুত্র, আমি মন থেকে চাইতাম, তুমি পড়ালেখা শিখে অনেক বড় হও, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হও। আজ তুমি সচ্ছল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। অনেকদিন ধরে তোমাকে দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল। তাই সেদিন কিছু না জানিয়েই তোমার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তোমার সন্তানদের ভয় দেখানোর জন্য আমি দুঃখিত। আমি বুঝে উঠতে পারিনি। এমন অন্যায় কাজ করায় নিজেকে অনেক তিরস্কার করেছি আমি। তুমি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আসবে শুনে খুবই খুশি হয়েছি। ভাবছিলাম, তোমাকে এক নজর দেখতে পাব; কিন্তু পরে মনে হলো, স্কুলে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ, আমি চাই না, আমার জন্য আর কখনো তুমি মানুষের সামনে বিব্রত হও। এদিকে বিছানা থেকে ওঠার মতো শক্তিও আমার নেই। কতটা বছর একটি কথা আমি নিজের মধ্যেই চেপে রেখেছিলাম। আজ তোমাকে সেই গোপন কথাটি বলছি—ছোটবেলায় তোমার একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সেই দুর্ঘটনায় তোমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। বাবা আমার, ছেলের এক চোখ নষ্ট হওয়া সহ্য করা পৃথিবীর কোনো মায়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, চোখ হারিয়ে তোমার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছিল। ভালোমতো চলাফেরাও করতে পারছিলে না। তোমার সেই অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলাম; কিন্তু টাকা দিয়ে চোখ কিনে তোমার অপারেশন করানোর সামর্থ্যও আমার ছিল

না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে নিজেরই এক চোখ তোমাকে দান করেছিলাম যেন জীবনে তোমার কোনো কষ্ট না হয়। এরপর অপারেশন করে ডাক্তার আমার এক চোখ তুলে তোমাকে দিয়েছিলেন। তোমাকে এক চোখ দিতে পেরে আমি যে কী পরিমাণ খুশি হয়েছিলাম তা যদি তুমি জানতে! যখনই ভাবনায় আসত যে, আমার সন্তান আমার চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখবে, তখন যে কী পরিমাণ ভালো লাগত তা বোঝানোর ভাষা আমার জানা নেই। জানি না, তোমার সাথে আমার আর কখনো দেখা হবে কি না। তবুও দুআ করি, যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখুন।'

ত্যাগ ও বিনিময়

গভীর রাত। কীভাবে যেন অ্যাপার্টমেন্টের নিচ তলায় আগুন লেগে গেল। আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকল সারা অ্যাপার্টমেন্ট জুড়ে। এই অ্যাপার্টমেন্টেরই একটি ফ্ল্যাটে, একজন নারী তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে থাকেন। সে রাতে সন্তানেরা তাঁর সাথেই ঘুমাচ্ছিল। আর পাশের কক্ষে ঘুমাচ্ছিল তাঁর বৃদ্ধা মা, যিনি মেয়ের সাথেই থাকেন। অফিসের কাজে তাঁর স্বামী সেদিন বাসার বাইরে ছিলেন।

আগুন লাগার বেশ কিছুক্ষণ পর দমকল বাহিনীর লোকেরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে। সাইরেনের শব্দে তখন কান পাতা দায়। অগ্নি-নির্বাপক কর্মীরা মাইকে ঘোষণা দিলেন সবাইকে দালান থেকে বেরিয়ে আসতে। কেউই যেন ভেতরে না থাকে। পুরো বিল্ডিং খালি করতে হবে।

সাইরেনের শব্দ আর লোকজনের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল ওই নারীর। ভয় পেয়ে কী হচ্ছে দেখার জন্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন—নিচ তলায় আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের লেলিহান শিখা উঁচু থেকে উঁচুতে তরতর করে উঠে আসছিল। বিভিন্ন তলা থেকে মানুষ সাহায্যের জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। মানুষের ছুটোছুটি, বাচ্চাদের কান্না আর আহাজারির রোল পড়ে গেল চারদিকে। আগুন থেকে নিজে বাঁচতে আর পরিবারকে বাঁচাতে লোকজনের সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা!

ওই নারী দ্রুত তাঁর দুই মেয়েকে জাগিয়ে দিলেন। বললেন, তারা যেন দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যায়। দুই বোন সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে ছুটল। ইতোমধ্যে আগুন ফ্ল্যাটের দরজায় চলে এসেছে।

ঘরে কেবল তারা তিনজন—চলনশক্তিহীন বৃদ্ধা মা, তাঁর কোলের দুগ্ধজাত শিশু আর তিনি নিজে। চরম দ্বিধায় পড়ে গেলেন তিনি—মা আগে না সন্তান? কাকে বাঁচাবেন? দুজনকে একসাথে বয়ে নেওয়াও অসম্ভব। এদিকে আগুন ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাঁকে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্ষুনি নিতে হবে। তিনি এক মুহূর্তও আর ভাবলেন না। নিজের শোবার রুমে কোলের শিশুকে রেখে তিনি ছুটে গেলেন বৃদ্ধা মায়ের রুমে। বৃদ্ধা মাকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটলেন সিঁড়ি ধরে। তিনি একপ্রকার ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁর ছোট্ট সোনাকে তিনি আর কোনোদিন দেখবেন না। লেলিহান আগুনের শিখা তাঁকে ছাই করে ফেলবে। ভাবতেই তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমে এলো।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলেন—পুরো ফ্ল্যাটে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আগুনের তাপে বাচ্চা ছেলেটা তীব্র আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগল। রাস্তা থেকে শিশুটির তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কেউই জ্বলন্ত ফ্ল্যাটে ঢোকার সাহস করল না।

বাচ্চাটি এখনো দুধ ছাড়েনি, মায়ের কোল ছাড়েনি। এই নিষ্পাপ একটা শিশু এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে ভাবতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। তাঁর দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। তিনি যে নিজের হাতে তাঁর সন্তানটিকে ফেলে এসেছেন! এসব চিন্তা মাথায় আসার পর ভীষণ

অপরাধবোধও কাজ করতে লাগল নিজের মধ্যে। তীব্র আবেগ আর আকুতি নিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দুহাত তুলে দুআ করলেন, তিনি যেন তাঁর নাড়িছেঁড়া ধনকে রক্ষা করেন।

আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলকর্মীরা নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে তারা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনেও ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর একজন উদ্ধারকর্মী ধোঁয়াভরা দালান থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। তাঁর কোলে যত্নে আগলে ধরা সেই ছোট্ট শিশুটি। এরকম আগুনের উত্তাপেও কোনো ক্ষতিই হয়নি তাঁর। এই দৃশ্য দেখে ভিড়ের মধ্যে উল্লাসধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। রাস্তায় সবাই আনন্দ করতে লাগল, খুশিতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। সবাই চিৎকার করে করে—আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! বলতে লাগল।

ওই নারী খুশির ধ্বনি শুনে নিচে তাকালেন। দেখলেন একটা শিশুকে নিয়ে সবাই উল্লাস করছে। তিনি দৌড়ে নিচে নেমে এলেন। দেখলেন এটা তাঁরই সন্তান। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। আগুনের একটু ছোঁয়াও লাগেনি তাঁর সন্তানের শরীরে। তিনি পরম মমতায় ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। সিজদায় পড়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

কীভাবে সম্ভব হলো এমন অসম্ভব একটি কাজ? ওই নারী তাঁর মায়ের জীবনকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রতিদানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আগুনের নিকট রেখে আসা তাঁর সন্তানকে বাঁচিয়ে দিলেন অক্ষত অবস্থায়। সুতরাং মায়ের প্রাপ্য অগ্রাধিকার যে দেবে, আল্লাহ তাকে কখনোই হতাশ

করবেন না। তাছাড়া তিনি নিজেও একজন মা। সন্তানের জন্য প্রসারিত মায়ের দুহাত, কান্না বিজড়িত আর্তনাদ রাব্বুল আলামিন কবুল করে নিয়েছেন।১ [[১] ঘটনাটি ইন্টারনেট থেকে এই বইয়ের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। অনেক পত্রিকায়ও এটি প্রকাশিত হয়েছিল।]

তবুও সৌভাগ্যবান

আব্দুল্লাহ বানিমাহ ছিলেন ইয়েমেনের মানুষ। সৌদি আরবের বন্দর শহর জেদ্দায় তাঁর বাস। তাঁর জীবনের লক্ষ্য মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এই দ্বীন-প্রচারকের কোমরের নিচের অংশটুকু ছিল অবশ। তিনি এতই দুর্বল আর অক্ষম যে, কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টাতেও তাঁর কষ্ট হতো। মানুষকে তিনি দাওয়াত দিতেন ইসলামের। তাওহীদ ও রিসালাতের আমন্ত্রণ দেওয়ার সাথে সাথে তিনি মানুষকে বাবা-মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। তাঁর শরীরের এই অথর্ব অবস্থার কারণ ছিল তাঁর বাবার সাথে ঔদ্ধত্য আচরণ। বাবার সাথে খারাপ আচরণ করে তিনি জীবনে যে অভিশাপ কুড়িয়েছেন, অপর কারও সাথে যেন সেরকম কিছু না ঘটে, সেজন্য তিনি মানুষকে নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে সাবধান করেন। তাঁর একটি সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হলো:

—‘সম্মানিত আব্দুল্লাহ বানিমাহ, পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কিত আপনার ঘটনাটি খুবই সুপরিচিত। যারা পিতা-মাতার মর্যাদা সম্পর্কে অসচেতন, তাদের জন্য এই ঘটনাটি একটি শিক্ষা। আপনি কি আমাদের এ সম্পর্কে কিছু বলবেন?’

—‘সকল প্রশংসা আল্লাহর! আমি একজন জ্ঞান অন্বেষী ব্যক্তি। আমার কাহিনিটা বলার উদ্দেশ্যে—অন্যদের এ ব্যাপারে সতর্ক করা। পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ آيه ﴿٥٥﴾

"এবং (হে মুহাম্মদ, কুরআনের মাধ্যমে) উপদেশ দিতে থাকুন; কারণ, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।"১ [[১] আজ-যারিয়াত ৫১ : ৫৫]

শুরুতে আমি বলতে চাই—আল্লাহর রাহমাতেই আমি তাওবা করার সুযোগ পেয়েছি। তিনিই আমাকে জীবিত রেখেছেন। তাই আমি বাকি জীবনে তাঁর দ্বীনের জন্য কিছু করতে পারছি। লোকদের ইসলামের সত্য-সুন্দর পথের দিকে আহ্বান করতে পারছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহর এই দয়াকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। এটা সত্য যে, আমার শরীরের নিচের অংশ অক্ষম হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান, কারণ, আমি তাওবা করার সুযোগ পেয়েছি। কিছুটা হলেও আমি দ্বীনের জন্য কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। এজন্য আমি আমার রবের প্রতি কৃতজ্ঞ। এ কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না কখনোও।

ঘটনার শুরু আমার যৌবনে। একটা সময় আমি খারাপ ছেলেদের সাথে মিশতে শুরু করেছিলাম। ধূমপান করতাম। কেউ একদিন আমার ধূমপানের কথা আমার বাবাকে জানিয়ে দিল। সন্তানের ধূমপান অথবা যে কোনো বদভ্যাস-ই মেনে নেওয়া সব বাবার জন্যই কষ্টকর। তো স্বাভাবিকভাবেই এটা শুনে আমার বাবাও খুব কষ্ট পেলেন। রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ধূমপান করো—কথাটা কি সত্যি?" আমি জবাব দিলাম, "না, একদম না। আজ পর্যন্ত আমি তো কখনো সিগারেট স্পর্শও করিনি। কে তোমার কাছে এইসব মিথ্যা গুজব ছড়িয়েছে?"

বাবার সাথে অকপটে মিথ্যা বলছি, সেদিকে আমার কোনো পরোয়াই ছিল না। থাকবেই বা কীভাবে? আল্লাহ, যিনি আমার রব, তাকেই তো তখন আমি ভয় করতাম না। তাই আমি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় মিথ্যা বলছিলাম। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহান্নামের দিকে।২ [[২] বুখারী, মুসলিম]

"সত্যি কি তুমি ধূমপান করো না? এই অভিযোগ কি মিথ্যা?"—বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"বললাম তো, আমি সিগারেট খাই না। কেন তুমি একই প্রশ্ন বার বার করছ আমাকে?" এবং একপর্যায়ে আমি প্রচণ্ড রেগে গেলাম এবং বাবাকে বলে বসলাম, "তুমি কী চাও? আমি একশোবার সিগারেট খাব, তাতে তোমার কী?"

আমার চিৎকার আর ঔদ্ধত্য আচরণে বাবা খুব কষ্ট পেলেন। তাঁর ভীষণ অনুগত সন্তানের এরকম চারিত্রিক অধঃপতনে তিনি খুব মর্মাহত হলেন। বাবা আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "যদি তুমি সিগারেট খেয়ে থাকো, আল্লাহ যেন তোমার কোমর ভেঙে দেন।"

আমি বাবার এসব কথার গুরুত্ব দিইনি একটুও। যেন কিছুই ঘটেনি। ভাই, এই মুহূর্তে আপনি আমাকে পঙ্গু অবস্থায় দেখছেন, কিন্তু আমি অন্তত জীবিত আছি, আলহামদু লিল্লাহ। আমি কৃতজ্ঞ যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে জীবিত রেখেছেন। আমি অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ না করুন,

যদি বাবার অভিশাপ আমার জীবনের বিরুদ্ধে হতো, আর আল্লাহ তা কবুল করে নিতেন তবে আমার অবস্থা কী হতো? পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই কি আল্লাহর সন্তুষ্টি না? পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন—এটা কি সত্য নয়? পিতা-মাতার অবাধ্যতাকারী কি জাহান্নামের উপযুক্ত নয়?

আত্মবিশ্বাসের সাথে মিথ্যা বলে বাবাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁকে অপমান করেছিলাম। তিনি শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন যে—আমি ধূমপান করি। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মুখ থেকে আচমকা অভিশাপ বেরিয়ে আসে।

সেই রাতে খাবার খাওয়ার পর ঘুমাতে গেলাম। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে কলেজে গেলাম। কলেজ থেকে ফেরার পর গেলাম সুইমিং পুলে। বন্ধুদের সাথে সাঁতার কাটতে, একসাথে সময় কাটাতে ভারি ভালো লাগত আমার।

সুইমিং পুলে গিয়ে দেখি পানি আসার কলটা বন্ধ। বন্ধুরা পরামর্শ করল—আজ না হয় বাড়ি ফিরে যাই; কিন্তু আমিই ওদের নিষেধ করলাম। ভালো সাঁতারু ছিলাম আমি। বললাম, “কল খুলে দেবো, অপেক্ষা করো।” কলটা ছিল পুলের একদম তলায়। পুলটি প্রায় সাড়ে তিন মিটার গভীর ছিল। আমার উচ্চতা দুই মিটারের কম। আমি একটি চেয়ারের সাহায্যে পুলের তলায় পৌঁছানোর চেষ্টা করলাম। পানিতে ডুব দেওয়ার পরে কীভাবে যেন চেয়ারের নিচে আটকা পড়ে গেলাম আমি। নড়তে পারছিলাম না একটুও। বন্ধুরা ভাবল, আমি মজা করার জন্য গভীরে ডুব দিয়েছি। এদিকে সর্বাত্মক

চেষ্টা করেও আমি চেয়ারের তলা থেকে বের হতে পারছি না। ওদিকে দম ফুরিয়ে আসছে দ্রুত; কিন্তু আমি ব্যর্থ হচ্ছি নিজেকে ছাড়াতে। প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগল আমার। হাঁশপাশ করছি এই আটক অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য। কিন্তু হায়! আমি বার বারই ব্যর্থ হচ্ছি!

একটা সময় একেবারে নিশ্চিত হলাম যে, আমি মারা যাচ্ছি। কল্পনাতে নিজের গোসল-জানাযা-দাফন-কাফন দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ ডুবন্ত অবস্থাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি শিক্ষার কথা মনে পড়ল—নিজের ভালো কাজের উল্লেখ করে দুআ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন; বিশেষ করে যখন কেউ বিপদে থাকে। মনে পড়ল, নিয়মিত এক বৃদ্ধাকে কিছু টাকা দিতাম। যখনই টাকাটা হাতে দিতাম, তিনি উপরের দিকে হাত তুলে দুআ করতেন। এটি উল্লেখ করে আমি আল্লাহর নিকট দুআ করতে লাগলাম। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন: "যে ব্যক্তির শেষ বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে, সে জান্নাতে যাবে।"১ [[১] সুনান আবী দাউদ, আল-জানাইজ, হাদীস : ৩১১৬, শাইখ আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

তাই আমি কালিমা শাহাদাত২ [[২] সাক্ষ্য দেওয়া : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'] পাঠ করতে লাগলাম। নিঃশ্বাসের জন্য আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, মুখ হাঁ করতেই একগাদা পানি ঢুকে গেল বুকে, পেট ফুলতে শুরু করল। এরপর কখন জ্ঞান হারিয়েছি, জানি না।

পরে ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি—প্রায় পনের মিনিট পর আমাকে পানি থেকে উপরে তোলা হয়। এই সময়ের মধ্যে আমার মারা যাওয়ার কথা; কিন্তু আমার রব ভাগ্যে অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে আমার বেঁচে যাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিচের হাদীসটি মনে করিয়ে দেয়:

"ভালো কাজ খারাপ মৃত্যুতে বাধা দেয়।"৩ [[৩] তাবরানী]

পানি থেকে তোলার পরে নাকি পেটে চাপ দেওয়া হয়েছিল; অনেক পানিও বেরিয়েছিল পেট থেকে। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাসপাতালের বিছানায়। আমার শরীরের নিচের অংশ অচল হয়ে গেছে। হাসপাতালে প্রথমে গলার চিকিৎসা করা হয়। গলায় একটি ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল—শ্বাস নিতে কষ্ট হতো। নয় মাস কোনো কথা বলতে পারিনি, শ্বাস নিলে গলার ছিদ্র দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যেত। তাই অক্সিজেন নিতে হতো অনেক দিন। শরীরে এ পর্যন্ত ষোলটি অপারেশন হয়েছে। এখনো আমার নিম্নাংশ সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে আছে। দশ থেকে বারো বছর ধরে চিকিৎসা চলছে। বিগত চৌদ্দটি বছর আমি কেবল বিছানাতেই পড়ে আছি। এত লম্বা সময় নিশ্চল শুয়ে থাকা খুব কষ্টের। আল্লাহই আমাকে ধৈর্য ধরার তাওফীক দিয়েছেন। আমার এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। সময় নষ্ট করেছি, মিথ্যা বলেছি, খারাপ ছেলেদের সাথে মিশেছি। পাপের শাস্তি হিসেবে আমি যৌবনকে হারিয়েছি। এখনো কষ্ট ভোগ করছি। গত চৌদ্দ

বছর যাবত আমার মা আমার দেখাশোনা করে চলেছেন, তাঁর ঋণের ব্যাপারে কিছু বলতেও আমার লজ্জা লাগে।

বেশ কিছুদিন আগে জনাবিশেক ইয়াতিম ছেলের একটি দল দেখা করতে এসেছিল আমার সাথে। বিছানার চারপাশে বসে তারা আমার অবাধ্যতার কাহিনি শুনল, নানা প্রশ্নও করল। শেষে সবাই বেরিয়ে গেলেও একজন দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটি অঝোরে কাঁদছিল। তাঁর কান্না শুনে অন্যরা ফিরে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কাঁদছ কেন?” সে বলল, “আবদুল্লাহ, আমার আফসোস, আমি যদি আপনার মতো হতাম।”

আমি ছেলেটিকে বললাম, “ভাই, আল্লাহ মাফ করুন। তুমি আমার জায়গায় আসতে চাইবে কেন?”

—“আপনার তো বাবা-মা আছে; কিন্তু আমাদের মাথার উপর তাদের ছায়া নেই। যদিও শারীরিকভাবে আপনি বিকল তবুও আপনি সৌভাগ্যবান; কারণ, আপনি বাবা-মায়ের সাথেই আছেন। অথচ আমাদের জন্য দুআ করার মতোও কেউ নেই। বাবা-মা যে কী অমূল্য রত্ন সেটা ইয়াতিমরাই কেবল বুঝতে পারে।”

ছেলেটির কথা শুনে আমি লজ্জিত হলাম। আমরা বাবা-মায়ের সেবায় পিছিয়ে আছি অনেক। অথচ তারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, আমাদের বড় করে তুলেছেন। আমরা যেন বাবা-মায়ের অবাধ্য না হই। তারা যে আমাদের জন্য কত বড় নিয়ামত সেটা বুঝতে যেন বড্ড দেরি করে না ফেলি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

রেস্টুরেন্টে একদিন

একবার এক ছেলে তার বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেল। বয়সের ভারে বৃদ্ধ বাবা ন্যুব্জ হয়ে আছেন। বৃদ্ধের শরীরে একধরনের কাঁপুনি ছিল। ছেলেটি তার বাবাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। বাবার প্রিয় খাবারগুলো অর্ডার করে বাবার হাত ধরে সে কিছু কথাবার্তা বলছিল। যখন খাবার চলে এলো, তখন বৃদ্ধ তাঁর কাঁপা কাঁপা হাতে মুখে খাবার তুলে নিচ্ছেন। মুখে দেওয়ার সময় খাবারের বেশিরভাগ অংশই তাঁর শরীরে পড়ছিল এবং তাতে কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। এরকম দামি রেস্টুরেন্টে এই দৃশ্য দেখে আশপাশের অন্যান্য লোকেরা নাক সিঁটকানো শুরু করল; কিন্তু বৃদ্ধ পিতার প্রতি ছেলের কোনো অভিযোগ, অনুযোগ বা আপত্তি নেই। খাওয়া শেষ হলে ছেলেটা খুব যত্নের সাথে তার বাবার শার্ট ও দাড়িতে লেগে থাকা খাবারের অংশ পরিষ্কার করে দিল। নিজ হাতে বাবাকে পানি পান করালো। আশপাশের মানুষগুলো তখনো তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল; কিন্তু ছেলেটির সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে যখন বিল পরিশোধ করে বেরোতে যাবে, তখন রেস্টুরেন্টে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে তাকে বলল, "মাফ করবেন। আপনি কি কিছু রেখে যাচ্ছেন এখানে?"

ছেলেটি লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "না তো, কিছু রেখে যাচ্ছি বলে মনে পড়ছে না আমার।"

লোকটি বলল, "আপনি অবশ্যই কিছু রেখে যাচ্ছেন। আপনি আজ এই রেস্টুরেন্টে প্রতিটি সন্তানের জন্য এই শিক্ষা রেখে যাচ্ছেন যে, কীভাবে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবাযত্ন করতে হবে। কীভাবে তাঁদের শখ-আহ্লাদকে প্রাধান্য দিতে হবে। সাথে সাথে আপনি সব পিতা-মাতার জন্য একটা আশা জাগিয়ে যাচ্ছেন যে, আপনার মতো সন্তান হলে পৃথিবীর কোনো বাবা-মা-ই অসুখী হবে না।"

আমরা অনেকেই আমাদের বাবা-মাকে নিয়ে ভালো জায়গায় ঘুরতে, ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে অনীহা দেখাই। আমরা ভাবি, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া আমাদের বাবা-মায়েদের সেখানে নিলে আমাদের ব্যক্তিত্ব সংকটে পড়বে। অথচ আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে কান্না শুরু করে দিতাম—তখন আমাদের বাবা-মা আমাদের নিয়ে কোথাও যেতে, কোথাও খেতে অনীহা দেখাননি। তাঁরা একটিবারের জন্যও ভাবেননি যে, আমাদের জন্য তাঁরা ব্যক্তিত্ব সংকটে পড়ে যাবেন। অথচ কী অদ্ভুত আচরণটাই না পান তাঁরা আমাদের থেকে!

মায়ের মিথ্যে বলা

আমি ছিলাম গরিব মায়ের একমাত্র সন্তান। বুঝতে শেখার পর থেকেই দেখতাম, ঘরে খাওয়ার জন্য তেমন কিছু থাকত না। সামান্য কিছু খাবার জোগাড় হলে মা আমাকে তাঁর ভাগের অংশটুকু দিয়ে বলতেন, "তুই খা বাবা, আমার খিদে নেই।"

আমি আরেকটু বড় হওয়ার পর দেখতাম, ঘরের কাজ শেষ করেই মাছ ধরতে চলে যেতেন মা। একদিন তিনি মাত্র দুটো মাছ ধরে আনতে পারলেন। তড়িঘড়ি করে বাড়ি ফিরে সেগুলো রান্না করে আমাকে খেতে দিলেন। আমি একটা মাছ খেয়ে কাঁটাগুলো ফেলে রাখলাম। দেখলাম, মা আড়াল থেকে সেগুলো তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন। আমার এত বেশি খারাপ লাগল যে, দ্বিতীয় মাছটা খেতে আর ইচ্ছে হলো না। আমি মাকে খেতে দিলাম; কিন্তু তিনি থালাটা আমার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই খা বাবা, আমি মাছ খুব একটা পছন্দ করি না।"

এরপর আমি যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম, তখন আমার মা একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ পেলেন। তিনি সারাদিন ঘুরে ঘুরে মানুষের বাড়ি গিয়ে কাপড় বিক্রি করতেন। এক শীতের সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে মায়ের বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যখন দেখলাম তিনি ফিরছেন না, আমি নিজেই তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলাম। সব জায়গায় খোঁজার পর দেখলাম, তিনি এক বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কাপড় বিক্রি

করছেন। আমি বললাম, "মা, দয়া করে এখন বাড়ি চলো। তোমাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।" তিনি মমতার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা, আমি একদমই ক্লান্ত নই।"

একবার শেষ পরীক্ষার দিন মা আমার সাথে পরীক্ষার হলে যেতে চাইলেন। কাঠফাটা রোদে হলের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি আমার পরীক্ষা ভালো হওয়ার জন্য দুআ করতে লাগলেন। আমি পরীক্ষা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে তিনি দৌড়ে এসে আমাকে আখের রস খেতে দিলেন। আমি তৃপ্তির সাথে গ্লাসের অর্ধেকটা পান করলাম। লক্ষ করলাম, তাঁর মুখ ঘামে ভিজে গেছে। তাই গ্লাসটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "নাও মা, এইটুকু তুমি খাও।" তিনি বললেন, "না বাবা, তুই খা। আমার একদমই তেষ্টা পায়নি।"

আমি যখন খুব ছোট তখনই আমার বাবা মারা যান। সংসারের সমস্ত বোঝা মাকে একাই বইতে হয়। সংসার চালাতে গিয়ে মাকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হতো। প্রায়ই আমাদের বাড়িতে কোনো খাবার থাকত না। আমার এক চাচা অনুগ্রহ করে মাঝেমধ্যে আমাদের জন্য কিছু খাবার পাঠাতেন। আমাদের দুরবস্থা দেখে প্রতিবেশীরা মাকে আবার বিয়ে করতে বলত। কারণ, তিনি তখনো অল্পবয়সী ছিলেন। তারা বলত, বিয়ে করলে তোমার স্বামী তোমাকে সাহায্য করতে পারবে; কিন্তু মা আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "না, আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই।"

আল্লাহর রাহমতে পড়াশোনা শেষ করে আমি একটা ভালো চাকরি পেলাম। ভেবেছিলাম, মাকে এবার বিশ্রাম দেব। সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেব। তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমি আমার বেতনের একটা অংশ তাঁর হাতে তুলে দিতে চাইলাম, যেন তাঁকে আর কাজ করতে না হয়; কিন্তু মা আমার কাছ থেকে টাকাটা নিলেন না। বললেন, "আল্লাহর রাহমতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই আমার আছে। আমার টাকার দরকার নেই। এই টাকা আমার কোনো কাজে লাগবে না বাবা। এটা তোমার কাছেই থাক।"

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জার্মানিতে ভালো একটা কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ পেলাম। সুযোগটা হাতছাড়া না করে চাকরির জন্য চলে গেলাম জার্মানিতে। সেখানে থিতু হওয়ার পর ভাবলাম, মাকে নিয়ে আসব আমার কাছে। তাকে ফোন করে নিজের ইচ্ছের কথা জানালাম; কিন্তু এতে আমার ঝামেলা হবে এই চিন্তা করে তিনি বললেন, "বাবা, তুই তো জানিস, নিজের দেশে থাকতেই আমি পছন্দ করি। দেশ ছেড়ে অত দূরে আমি থাকতে পারব না। আমি এখানেই ভালো আছি।"

অতিরিক্ত কাজ করার কারণে মা বয়স বাড়ার সাথে সাথে খুব দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। আমি অনেক দূরে থাকায় প্রায়ই তিনি মনঃকষ্টে ভুগতেন। হঠাৎ একদিন তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ল। জানতে পেরে সব ছেড়ে দিয়ে আমি ছুটে এলাম মাকে দেখতে। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন; কিন্তু তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, চোখ দুটি মেলে রাখতে

পারছিলেন না। তাঁকে এমন করুণ অবস্থায় দেখে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। অশ্রু গড়িয়ে তাঁর গায়ে পড়লে তিনি চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "কাঁদিস না বাবা, আমি তো ঠিকই আছি। একদমই কষ্ট হচ্ছে না আমার।"

সেইবার শেষবারের মতো মা আমাকে মিথ্যা বললেন। তারপর তিনি চোখ বন্ধ করে চিরদিনের মতো ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন।১ [[১] মিথ্যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় এবং হারাম কাজ। তবে এই গল্পে সন্তানের কল্যাণস্বার্থে সাধারণ কথা ঘুরিয়ে বলাকে মিথ্যা বলা হয়েছে রূপক অর্থে। তাছাড়া কারও কল্যাণের স্বার্থে তার সাথে মিথ্যা বলা জায়িজ।]

অবহেলা

এমন অনেক সন্তানই আছে, যারা মায়ের চেয়ে স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসে। এ গল্পটি এমনই এক দুর্ভাগা ব্যক্তির। এক স্বর্ণকার ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

রমজানের শেষ দিকে এক লোক তার মা, স্ত্রী আর কোলের শিশুকে নিয়ে আমার দোকানে স্বর্ণ কিনতে এলো। বৃদ্ধা মা শিশুটিকে কোলে নিয়ে দোকানের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের নারী।

দম্পতি অনেকগুলো অলংকার পছন্দ করল, যেগুলোর সর্বমোট মূল্য ছিল বিশ হাজার রিয়াল। মায়ের দৃষ্টিও অলংকারের দিকে গেল। তিনি দোকানের এক কোণায় থাকা আংটিগুলো দেখছিলেন। একটি আংটি পছন্দ করে তিনি সেটা একটু নেড়েচেড়ে আঙুলে পরে দেখলেন। আংটিটার দাম ছিল প্রায় একশ রিয়াল।

ছেলেটা কাউন্টারে এসে অলংকারের দাম পরিশোধ বাবদ বিশ হাজার রিয়াল দিল। আমি তার কাছে আরও একশ রিয়াল চাইলাম। সে বলল, "কী আশ্চর্য! আমি নিজে হিসাব করে দেখেছি, দাম আসে ২০ হাজার রিয়াল; কিন্তু আপনি দেখছি আরও একশ রিয়াল বেশি দাম চাচ্ছেন।"

আমি বললাম, "ভাই, আপনার মা যে আংটিটা নিয়েছেন, সেটার দাম একশ রিয়াল। আপনি সম্ভবত সেটার দাম হিসাব করেননি।"

কথাটি শোনামাত্র সে ভ্রু কুঁচকিয়ে বলল, "বুড়ো মানুষের আবার স্বর্ণ লাগবে কেন?" এরপর মায়ের কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "আংটিটা কোথায়?"

মা-জননী নিজের হাতের আঙুল ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বাম হাতের মধ্যমা আঙুলে তখনো আংটিটা রয়েছে। মায়ের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে ছেলেটা কাউন্টারের উপর রেখে স্বর্ণের প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তার এই আচরণে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

বৃদ্ধা মা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেন; কিন্তু ভেতরের হতাশা স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল তাঁর চেহারায়। তাঁর হৃদয় যেন ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। নাতিকে কোলে নিয়ে তিনিও দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দোকান থেকে বের হতেই ছেলেটার স্ত্রী তাকে বলল, "আংটিটা কিনে দিলে না কেন মাকে? একটা সামান্য জিনিসের জন্য তুমি তাকে কষ্ট দিয়েছ। সে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেলে তোমার বাচ্চাকে দেখবে কে? কে গোসল করাবে? কে খাওয়াবে?"

স্ত্রীর কথা শুনে ছেলেটা ভাবল, সত্যিই তো। তার মা যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাদের সন্তানকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করবে কে? তার বউ তো আর সন্তান কোলে নিতে পারবে না। সন্তান কোলে নিয়ে কি হাই ক্লাস সোসাইটিতে কেউ জীবনযাপন করে? সে বুঝতে পারল, অন্তত এই দিক বিবেচনায় মাকে আংটিটা কিনে দেওয়া উচিত ছিল। আংটিটি নেওয়ার জন্য ছেলেটি আবার দোকানে ঢুকল।

ছেলে যখন আংটি নিয়ে মায়ের কাছে গেল, তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন, "আল্লাহর কসম, জীবনে আর কখনো আমি স্বর্ণ পরব না। সামান্য এই আংটি ছাড়া তেমন কিছুই চাইনি তোমার কাছে। ভেবেছিলাম, ঈদের দিন এটা পরব। এখন ঈদের খুশিকে নিজের মধ্যে চাপা দিয়ে দিয়েছি। আমার সন্তান, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন!"

অনুশোচনার গল্প : হারিয়ে ফেলার পরে

আমি এক দুর্ভাগা ব্যক্তি। যদিও সারাজীবন আমি ছিলাম আমার মায়ের অনুগত। মা যখন যা বলতেন করতাম, যা চাইতেন এনে দিতাম; কিন্তু একদিন আমি এমন একটি ভুল করে ফেলি—যার আক্ষেপ সারাজীবন ধরে আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি জানি, এখন আর শত অনুশোচনা করলেও মা আর ফিরে আসবেন না। হে আল্লাহ, অবশ্যই স্বীকার করি, মা একটি বড় নিয়ামত। যে মায়ের ভালোবাসা পায়নি, তার মতো হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। আর আমি আমার সেই মমতাময়ী মাকে অবহেলা করেছি। এই ক্ষতি অপূরণীয়।

আজ আমার জীবনের সেই হতাশার কথাগুলোই আপনাদের বলছি। হয়তো এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আপনাদের জীবনেও কাজে আসতে পারে।

সেদিন আমি ইন্টারনেটে কুরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা পড়ছিলাম। আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বোঝার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে আয়াতগুলো বারবার পড়ছিলাম; কিন্তু আমি কোনোভাবেই সেগুলো আয়ত্ত করতে পারছিলাম না। আমি চেষ্টা করতে থাকলাম। ভাবলাম, এগুলো আয়ত্ত করতে না পারলে আজ উঠবই না।

আয়াতগুলো আমি এত বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম যে, খেয়ালই করিনি—এরই মধ্যে আমার মা আমাকে তিনবার ডেকে ফেলেছেন। এতবার

ডাকার পরেও আমার কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি গলার স্বর একটু বড় করলেন। যখন আরও জোরে জোরে আমার নাম ধরে ডাকতে থাকলেন ঠিক তখনই আমার খেয়াল হলো। আর আজ আমার মমতাময়ী মায়ের কণ্ঠ শোনার জন্য আমি ব্যাকুল, কিন্তু হায়! আজ তিনি একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। আমার ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো আর কোনো সুযোগ তাঁর নেই। কত দুর্ভাগাই না আমি। মায়ের শেষ সময়টাতে তাঁর ডাকে সাড়াটা পর্যন্ত দিতে পারিনি।

মায়ের মুখ-নিঃসৃত সেদিনের প্রত্যেকটি কথা এখনো আমার কানে বাজে। মা আমার কাছে এসে বলেছিলেন, "বাবা, তুই আমার কাছে এসে একটু বস। আমি তোকে কিছু কথা বলতে চাই। জানি না কেন আজ এই কথাগুলো বলতে এত ইচ্ছে হচ্ছে আমার। আমার মনটা একদম ভালো নেই বাবা। আজ রাতে তোকে কিছু ভালোলাগা স্মৃতির কথা বলব।"

আমি মায়ের কথার কোনো জবাব দিলাম না। কারণ, আমি তখন কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটি করছিলাম এবং মনোযোগ দিয়ে ইন্টারনেট থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজে সেগুলো অনুধাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকে একাগ্রচিত্তে কাজ করে যাচ্ছি দেখে তিনি আবার বললেন, "কম্পিউটারটা রাখ, আয়, দুজন বসে একসাথে কিছুক্ষণ কথা বলি। তোর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে

করছে বাবা। দয়া করে কম্পিউটার বন্ধ কর। আজ তোকে আমি অনেক কথা বলব।"

কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে চোখজোড়া মুহূর্তের জন্য তুলে আমি মায়ের দিকে তাকালাম। বললাম, "মা, আমি কিছুদিন থেকে একটা কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি। কুরআনের কিছু আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করছি। বিষয়টা খুবই জটিল। আলিমদের ব্যাখ্যাও ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। এর সমাধান করতে পারলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনেক উপকার হবে। তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।" এরপর আমি আমার দাঁড় করানো একটা ব্যাখ্যা মাকে দেখিয়ে বললাম, "এই ব্যাখ্যাটা দেখ মা, একেবারে সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করছি। খুব চমৎকার হয়েছে, তাই না?"

মা আমার ব্যাখ্যাটার দিকে তাকাননি। আমার চেহারার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। সেদিন আমি মায়ের এই অদ্ভুত চাহনির রহস্য ভেদ করার সময় পাইনি। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, মা বেশ কিছুক্ষণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি চাচ্ছিলেন কাজ থামিয়ে আমি যেন তাঁকে একটু সময় দিই; কিন্তু আমি তা করিনি। মাকে আমি সেদিন উপেক্ষা করেছি। আমি নিজের কাজে ব্যস্ত থেকেছি। এরপরও তিনি মমতার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটু পর আমি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম। বুঝলাম, তিনি তাঁর ঘরে চলে গেছেন।

মনে মনে ভাবছিলাম, মা যদি একটু রাগও করে থাকেন—কোনো সমস্যা নেই, কাল সব মিটমাট করে ফেলব, ইন শা আল্লাহ। মা তো সবসময়ই আমাকে মাফ করে দেন।

সত্যি বলতে, আমি ধর্মীয় কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম পরদিন সকালে মাকে আমি সমাধানটি বলতে পারব। তখন তিনি খুশি হয়ে আমাকে মাফ করে দেবেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবেন। কিছুক্ষণ পর এসব চিন্তা বাদ দিয়ে আমি আবার আমার কাজে মগ্ন হয়ে গেলাম। আয়াতগুলোর সরল ব্যাখ্যা বের করতে আবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আঠার মতো আমি কম্পিউটারের সাথে লেগে ছিলাম। কাজ শেষ হওয়ার পর হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। কম্পিউটার বন্ধ করে তাঁর ঘরে গেলাম। একে একে তিনবার মাকে ডাকলাম। কোনো সাড়া পেলাম না। সাধারণত একবার ডাকলেই মা সাড়া দেন; কিন্তু সেদিন কেন জানি কোনো উত্তর দিলেন না।

মায়ের শরীর খারাপ করল কি না—এই ভেবে আমিও চিন্তায় পড়ে গেলাম। কাছে গিয়ে মায়ের হাত ধরে দেখলাম, প্রচণ্ড জ্বরে তাঁর শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কাঁপছিলেন। তাঁর চোখজোড়া লাল হয়ে আছে। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমি এত ভয় পেয়ে গেলাম যে, কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাব কি না; কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—এটা বুঝতে আর বাকি রইল না।

তাই তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। মায়ের অবস্থা দেখে ডাক্তারগণ তাঁকে দ্রুত জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাকে সুস্থ করে তোলার জন্য ডাক্তাররা তাঁদের সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মায়ের অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর জরুরি বিভাগ থেকে একজন ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন, "ডাক্তাররা আপনার মায়ের চিকিৎসা করছেন। তারা তাঁদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছেন; কিন্তু আপনার মায়ের অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। তাঁর লিভারে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। সে কথা বলতে পারছে না। এই অবস্থায় তাঁর কথা বলাও উচিত না। আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। তাঁর জন্য দুআ করতে থাকুন। আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করছি।"

আমি বললাম, "ডাক্তার, আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতে পারি? আমি কাছে থাকলে বেশি ভালো হতো। আপনারা অনুমতি দিলে আমি কাছে থেকে মায়ের সেবা করতে চাই।"

ডাক্তার বললেন, "না, আপনি এখন ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। এতে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।"

আমার প্রচণ্ড অপরাধবোধ কাজ করছিল। মনে হচ্ছিল আমার শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যখন আমাকে মায়ের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখন আমি তাঁকে পাত্তা দিইনি। তাঁর কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করিনি। নিজের কাজ নিয়ে পড়ে ছিলাম। কত নিকৃষ্ট আমি! নিজেকে বারবার তিরস্কার করতে লাগলাম।

ডাক্তার কোনো ভালো খবর নিয়ে আসবে—এই আশায় ওয়েটিং রুমে বসে বসে অপেক্ষা করছিলাম আর আল্লাহর কাছে আমার মায়ের সুস্থতার জন্য দুআ করছিলাম। ক্লান্তিতে আমার শরীর ভেঙে আসছিল। কারও পায়ের শব্দ শুনলেই চমকে উঠে মাথা উঁচু করে দেখতাম যে মায়ের খবর নিয়ে কেউ আসছে কি না।

কিছুক্ষণ পর বেশ কয়েকজন ডাক্তার মায়ের ওয়ার্ডের দিকে ছুটে যাচ্ছেন দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমিও তাঁদের পিছু পিছু যেতে চাইলাম; কিন্তু তাঁরা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন না। ভেতরে কী হচ্ছে তা জানার জন্য আমি বাইরে থেকে ছটফট করছিলাম। একটু পরই দেখলাম ডাক্তাররা বের হয়ে আসতে শুরু করেছেন। একজন নার্স আমার দিকে ছুটে এলেন এবং মুখটা গম্ভীর করে বললেন, "আল্লাহ আপনাকে ধৈর্য দান করুন। আপনার মায়ের আত্মাকে মাগফিরাত দান করুন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

নার্সের মুখে আমার মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে কষ্টে আমার বুকটা ভারী হয়ে উঠল। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে মা আর বেঁচে নেই। আমি ওয়ার্ডের ভেতরে ছুটে গেলাম। দেখলাম একটা বিছানায় আমার মাকে লম্বালম্বি করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মায়ের কপালে, হাতে, গালে চুমু দিতে দিতে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমি বুঝতেও পারিনি—এভাবে হঠাৎ করে তিনি আমাকে একা ফেলে চলে যাবেন। সেদিন মায়ের না বলা কথাগুলো আর শোনা হলো না আমার। কতই না অভাগা আমি, মায়ের শেষ সময়টাতে

তাঁকে একটু সঙ্গও দিতে পারলাম না। সেদিন মায়ের লাশটাকে জড়িয়ে ধরে অবচেতনভাবেই চিৎকার করছিলাম খুব। "মাগো, আমাকে এভাবে একা রেখে চলে গেলে? আমি ভুল করেছি মা। আমি ভুল করেছি। তুমি আমাকে কী যেন শোনাতে চেয়েছিলে না? ও মা, আমি তো শুনতে চাই"—কথাগুলো বলতে বলতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

কিন্তু মা আমার ডাকে কোনো সাড়া দিলেন না। কীভাবে দেবেন? তিনি তো মহান রবের সাক্ষাতে চলে গেছেন ততক্ষণে। আর আমি তীব্র আক্ষেপ নিয়ে পৃথিবীর বুকেই বিচরণ করছি এখনো। ভারাক্রান্ত হৃদয়জুড়ে প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করছি মায়ের ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া না দেওয়ায় কী হারিয়েছি আমি। মা আজ অনেক দূরে। ভীষণ ভালোবাসি মা তোমাকে। রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানি সগিরা।

লোভের তাড়না

মিশরের এক ধনী লোকের তিন ছেলে ছিল। বৃদ্ধ বয়সে কোনো ছেলেই তাদের বাবা-মায়ের সেবাযত্ন করত না। বৃদ্ধ বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর যা সম্পত্তি আছে সব তিনি সন্তানদের ভাগ-ভাটোয়ারা করে দিয়ে দেবেন। এতে করে সন্তানরা লাভবান হবে এবং অন্তত এই জন্য হলেও তারা বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবাযত্ন করবে। সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করার পর তিনি স্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। স্ত্রীও সম্মতি দিলেন। কয়েকদিন পর সেই বৃদ্ধ বাবা ছেলেদের ডেকে বললেন:

"আমার সন্তানেরা, তোমরা জানো টাকা উপার্জনের পেছনে আমি আমার জীবন-যৌবন নিঃশেষ করে দিয়েছি। তোমাদেরকে আমি ভালো পরিবারের মেয়ে দেখে বিয়ে করিয়েছি। সময়ের বাস্তবতায় এখন আমি বৃদ্ধ। আগের মতো কাজ করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার সব সম্পত্তি তোমাদের ভাগ করে দেব। আমি চাই তোমরা এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করো। সম্পদের বিনিয়োগ করে তোমাদের ধন-সম্পদকে আরও বৃদ্ধি করো, জীবনকে সুখী করো। আর সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথেও ব্যয় করো; এবং তোমাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমাদের কিছুটা সেবাযত্নও করো। কারণ, আজ আমরা তোমাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। একবুক স্বপ্ন লালন করেছি তোমাদের নিয়ে। তোমরা সেই শৈশবে থাকতেই আমাদের কাজ, চিন্তা সবকিছু ছিল তোমাদের কেন্দ্র করেই।

তোমরা একদিন বড় হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে। আমরা আমাদের বার্ধক্যের সময়টুকু তোমাদের হাত ধরে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারব—এরকম স্বপ্নের জাল বুনেছি সারাজীবন। আমাদের অবহেলা করো না। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কাউকেই নিষ্ফল করবেন না।"

সন্তানেরা বাবা-মায়ের সেবাযত্ন করার প্রতিজ্ঞা করে নিজেদের সম্পত্তির অংশ বুঝে নিল; কিন্তু এরপর তারা নিজ নিজ ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছু দিনের মধ্যেই এমনভাবে সম্পদের নেশায় পড়ে গেল যে, বাবা-মাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করতে লাগল তারা। প্রত্যেকেই মনে করত বাকি দু ভাই বাবা-মায়ের সেবাযত্ন করবে। এমনকি তাদের কেউই বাবা-মায়ের সাথে দেখা পর্যন্ত করত না। অনেক সময় সারা মাসে একবারও বাবা-মাকে দেখতে যেত না।

একদিন বৃদ্ধ বাবার এক বন্ধু তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। মনের সব দুঃখের কথা তিনি খুলে বলেন বন্ধুকে। এখন তাঁর নিজের কোনো সম্পত্তি নেই। সবকিছু তিনি সন্তানদের দিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তারপরও সন্তানরা তাঁর প্রতি অবহেলা করে একথা বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তাঁর বন্ধু ছিলেন একজন বিজ্ঞ মানুষ। তিনি এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে চাইলেন। এরপর তিনি একটা পরিকল্পনা করে বৃদ্ধ লোকটিকে জানালেন; কিন্তু জানালেন যে—এই ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে যথাসম্ভব।

এরপর বাবার সেই বন্ধু একে একে তিন ছেলের কাছে গেলেন এবং সবাইকে একটি কথাই বললেন:

"বাবা, তুমি জানো আমি তোমার বাবার খুব পুরোনো বন্ধু। আমার পরামর্শ ছাড়া তোমার বাবা কখনোই কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। ব্যবসার লেনদেন, বেচা-কেনা এবং সকল সমস্যায় আমিই তাঁকে পরামর্শ দিতাম। অনেকদিন আগে তোমার বাবা সম্পদের একটা বড় অংশ আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর পরিমাণ তাঁর সমস্ত সম্পত্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তোমরা তো জানোই যে আমার নিজেরই অনেক সম্পত্তি রয়েছে। নিজের সম্পত্তির দেখভাল করতে গিয়ে তোমাদের বাবার হস্তান্তর করা সম্পদের ঠিকমতো দেখাশোনা করা আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই তোমার বাবার সম্পত্তি আমি ফিরিয়ে দিতে চাই। কাল সকালে তোমাদের সামনে এই সম্পদ তোমার বাবাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

শোনো, তোমাকে একটা গোপন কথা বলি। তোমার বাবার এখন বয়স হয়েছে। তাই সম্পদের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি নেই। এই সম্পত্তি তিনি তোমাদের দিয়ে দেবেন। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি তাদের সেবাযত্ন করবে, তাকেই তিনি এই সম্পদ দেবেন বলে আমার কাছে জানিয়েছেন। আমি তোমাকে এই গোপন কথাটা বললাম, কারণ আমি চাই তুমিই সবচেয়ে বেশি তাঁর সেবা করো। তোমার বাবার মুখে আমি তোমার প্রশংসা শুনেছি। আশা করি তিনি তোমাকেই সব সম্পত্তি দেবেন। তখন তুমি অনেক ধনী হয়ে যাবে। খবরদার, আমার কথাগুলো তোমার অন্য ভাইদের কানে যেন

না যায়। এই কথা শুনলে তারা তোমার কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়ে বসতে পারে। মনে থাকে যেন।"

বিজ্ঞ বন্ধুর কথায় তিন ভাই-ই বেশ অনুপ্রাণিত হলো। পরদিন খুব সকালে তিনজনই বাবার কাছে গেল। সবাই সাধ্যমতো বাবার সেবাযত্ন করে তাঁকে খুশি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে লাগল। এর কিছুক্ষণ পরই বাবার বন্ধু এলেন। তিনি তিন ভাইকে একত্রে দেখে খুব অবাক হলেন এবং বুঝতে পারলেন আজ সম্পদের লোভে এরা সবাই সকাল সকাল এসে উপস্থিত হয়েছে; অথচ আজ কতদিন হলো তারা বাবাকে দেখতে পর্যন্ত আসেনি। বাবার বন্ধুটি সাথে করে একটি তালাবদ্ধ ট্রাঙ্ক নিয়ে এসেছেন। সেটা এতই ভারী ছিল যে দুজন যুবক সেটাকে বহন করে নিয়ে এসেছিল।

বন্ধুটি বৃদ্ধ বাবাকে বললেন, "বন্ধু, তুমি আমার ওপর তোমার সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে; কিন্তু আমি আর এগুলো রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত। তাই তোমার সন্তানদের সামনে আমি সব ফিরিয়ে দিলাম।"

বাবা বন্ধুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জানতে চাইলেন ট্রাঙ্কে আসলে কী আছে? তিনি জানালেন এটা একটা চালাকি। তিনি কাউকে একথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এরপর তারা ছেলেদের কাছে ফিরে গেলেন।

বাবার বন্ধু বললেন, "তোমাদের বাবার সম্পদ আমি আজ তাঁর কাছে ফেরত দিলাম। তোমরা সবাই সাক্ষী থাক, এখন আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। এখন থেকে এর কোনো দায়-দায়িত্ব আর আমার ওপর থাকল না।"

একথা বলে তিনি বাবার হাতে ট্রাঙ্কের চাবিটি তুলে দিলেন।

এরপর বাবা বললেন, "আমার বন্ধু, তুমি সত্যি বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করেছ এবং আমার প্রাপ্য আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছ। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।"

বন্ধুটি বললেন, "তুমি সারাজীবন ভালো কাজ করেছ। আশা করি এই সম্পদ তুমি সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। তবে তুমি চাইলে তাদের যে-কোনো একজনকে সব দিতে পার, বা অন্য কারও কাছে এর দায়িত্ব অর্পণ করতে পার।"

এরপর বন্ধু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ট্রাঙ্কের ভেতরের সম্পদ দেখতে উৎসুক তিন ছেলে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা তাদের বললেন, তিনি কাকে ট্রাঙ্কটি দেবেন—এখনো তা ঠিক করেননি। তারপর তিনি বললেন, "আমি ট্রাঙ্কে একটা উইল লিখে দিয়ে যাব। আমার মৃত্যুর পর ট্রাঙ্কটি খুললে তোমরা এর মালিকের নাম দেখতে পাবে।"

তিন ছেলে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। কারণ তারা ভেবেছিল বাবা এখনই তাদের ট্রাঙ্কটি দিয়ে দেবেন; কিন্তু তারপরও সম্পদ পাওয়ার লোভে তারা প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতা করে বাবা-মায়ের সেবাযত্ন করতে শুরু করল। তাদের একজন একা বাবার সেবা করতে গেলে অন্যরা সপরিবারে যেত। বাবার পা টিপত, মাথা টিপে দিত, তেল মালিশ করত। রাতের বেলা গিয়েও তারা বাবার কিছু লাগবে কি না—সেই খোঁজখবর নিত। বৃদ্ধ বাবা তাদের অন্তরের খবর ভালো করেই জানতেন। অবস্থা এমন হলো যে বৃদ্ধ বাবার এই অনুগত সন্তানদের লোকেরা হিংসার চোখে দেখা শুরু করল; কিন্তু তারা

জানত না যে আদতে বাবার জন্য সন্তানদের মনে কোনো ভালোবাসাই ছিল না; যা ছিল, তার সবটাই মূলত বাবার সম্পত্তির জন্য।

ট্রাঙ্কটির চাবি সযত্নে একটি গোপন জায়গায় লুকানো ছিল। সন্তানেরা প্রতিযোগিতা করে বাবার সেবা করে যেতে থাকল। দুবছর এই অবস্থা চলল। তখন সন্তানরা দুশ্চিন্তা করতে লাগল বুড়ো আর কতদিন বাঁচবেন!

ওদিকে সন্তানদের এত আদর-ভালোবাসা পেয়ে বাবা খুবই খুশি ছিলেন। আরও দুবছর পর একদিন তিনি মারা গেলেন। কোনো রকমে বাবার দাফন-কাফন শেষ করেই ছেলেরা দ্রুত ট্রাঙ্ক খুলতে গেল। তারা গ্রামের লোকদের ট্রাঙ্কের বিষয়টা জানাতে চাইল না। কারণ এটা নিয়ে সবাই উপহাস করবে এবং তাদের সত্যিকার উদ্দেশ্য সবার কাছে প্রকাশিত হয়ে যাবে। তাই তারা বাবার পুরোনো বন্ধুকে হিসেবে রেখে তাঁকে দিয়েই ট্রাঙ্ক খোলার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর বাবার সেই বন্ধুকে ডেকে এনে তাঁর হাতে চাবি দিয়ে ট্রাঙ্কটি খুলতে বলল। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় প্রত্যেকে তখন উইলে নিজের নাম দেখার স্বপ্নে বিভোর। তারা প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সেবাযত্ন করেছে।

ট্রাঙ্ক খোলার পর তারা যা দেখল, তাদের চোখকে তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না; কিন্তু এই নির্মম বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। ট্রাঙ্কে টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা কিচ্ছুই নেই। কেবল পাথর আর মাটি। তারা হতবাক হয়ে গেল। ট্রাঙ্কের ভেতর একটা ছোট্ট কাগজের টুকরা ছিল। বাবার বন্ধু কাগজের টুকরাটি নিয়ে পড়া শুরু করলেন:

'পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এই ট্রাঙ্ক ও এর ভেতরের মাটি তোমাদের মতো অবাধ্য সন্তানের জন্য। তোমরা বাবার প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য সেবাযত্ন করোনি; বরং লোভের তাড়নায় করেছ।'

ছেলেরা লজ্জায় মারা যাচ্ছিল। তাদের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় তারা চরমভাবে অপমানিত হলো। তাদের চেহারা অপমানে লাল হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল এটা বাবার বন্ধুর চালাকি।

এরপর বাবার বন্ধু ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হ্যাঁ, এটাই হলো বিচক্ষণতা। এটা আমারই বুদ্ধি। আমিই মাটি ভরে নিয়ে এসেছিলাম। কারণ তোমাদের বাবা আমাকে বলেছিলেন সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার পরও তোমরা তাঁকে অবহেলা করেছ। তোমরা তোমাদের শপথ ভঙ্গ করেছ। তাই আমি এই চাল চেলেছি—যেন সম্পদের লোভে হলেও শেষ বয়সে তোমরা বৃদ্ধ বাবার সেবাযত্ন করো।"

বাবার বন্ধুর কথা শুনে তারা বুঝতে পারল যে বাবার প্রতি তারা দায়িত্ব পালন করেনি। তারা সত্যি অকৃতজ্ঞ লোভী সন্তান। একারণে তারা বাকি জীবন অনুতপ্ত হয়েছে।

অনুশোচনার গল্প : রক্তাক্ত আলেক্সেন্ড্রিয়া

জেলখানায় থাকা অবস্থায় একদিন পত্রিকা পড়তে গিয়ে একটি শিরোনামে আমার চোখ আটকে যায়—এক রক্তাক্ত ঘটনায় 'আলেক্সেন্ড্রিয়া' কেঁপে ওঠে।

খবরটিতে বলা হয়েছে মিশরের আলেক্সেন্ড্রিয়া শহরের এক যুবক ইয়াহুদি এক মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল; কিন্তু তার মা অসম্মতি জানায়। তিনি বাড়িতে কোনো অমুসলিম মেয়ে আনতে চাননি; কারণ তিনি ভয় পেতেন যে এর ফলে তাঁর যে নাতি-নাতনি হবে, তাদের ঈমান আরও দুর্বল হয়ে পড়বে; কিন্তু তারপরও ছেলেটি সেই মেয়েকেই বিয়ে করতে চায়। সন্তানদের কী হবে তা নিয়ে সে ভাবতে চাইছিল না।

এসব নিয়ে মায়ের সাথে কথা কাটাকাটি হওয়ার কোনো এক মুহূর্তে তিনি ছেলেকে সাফ জানিয়ে দেন যে এই মেয়েকে বিয়ে করে এ বাড়ির অমর্যাদা করতে তিনি দেবেন না। মায়ের এমন কথা শুনে ছেলেটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে মারতে মারতে সে তার মাকে মেরেই ফেলে।

পরে যখন তার হুঁশ ফেরে সে অস্থির হয়ে যায়। সারা রাত সে ঘুমোতে পারে না। অবশেষে আলেক্সেন্ড্রিয়া কারাগারে এসে সে আত্মসমর্পণ করে। ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচারক তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন।

ছেলেটি তার পাপের জন্য খুবই অনুতপ্ত। মায়ের মৃত্যুর পর দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে নিরর্থক মনে হতে লাগল। দিন-রাত সারাক্ষণ সে বিবেকের তাড়নায় কষ্ট পেত। সবসময় সে নিজেকে তিরস্কার করত। সে নিজেই অবাক হতো যে কীভাবে সে এত ভয়ঙ্কর একটি কাজ করল।

পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম ছেলেটি এই কারাগারেই আছে। তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো—আমার পাশের কয়েদটিতে যে ছেলেটি থাকে—এই নাকি সেই ছেলে। অথচ সালাতের সময় সে আমার কয়েদের পাশ দিয়েই হেঁটে যায়। যাওয়ার সময় প্রায়ই সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার বেশ ঘন দাড়ি ছিল বলেই সম্ভবত সে আমার দিকে এভাবে তাকায়। সে লম্বা ও রোগা প্রকৃতির একজন যুবক। দেখতে গুরুগম্ভীর। সে যখন কথা বলে, তাকে অনেকটা নিষ্পাপ মনে হয়।

একদিন সালাতে যাওয়ার পথে সে আমার কাছে এমনভাবে ছুটে এলো যেন সে হারানো কিছু খুঁজে পেয়েছে। সে বলল, ‘ভাই, আমি এক মহা পাপ করেছি। আমি আমার মাকে হত্যা করেছি। আমি কি তাওবা করতে পারব? আল্লাহ কি আমার পাপ ক্ষমা করবেন?’

আমি বললাম, ‘পাপ যত বড়ই হোক না কেন, আন্তরিক তাওবাকারীদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেন। তিনি বড়ই দয়ালু। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آيه ﴿٥٣﴾

"বলুন, আমার বান্দারা, তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের বিরুদ্ধে (পাপ ও খারাপ কাজের মাধ্যমে) সীমালঙ্ঘন করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"১ [[১] সূরা যুমার ৩৯:৫৩]

আমার মুখে এই পবিত্র আয়াতটি শোনার পর ছেলেটির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি বললাম, 'ভাই, আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। তোমার মায়ের জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আশা করি তোমার দুআর কারণে আল্লাহ তোমার মাকে ক্ষমা করবেন। তখন তোমার মাও হয়তো বিচারদিবসে তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। তাই তোমার উচিত—আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া।'

কথা শেষে আমরা নিজ নিজ কক্ষে চলে গেলাম। আমার পায়ে বেড়ি পরানো ছিল; কারণ আমি ছিলাম বিশেষ অপরাধীদের কয়েদে। এরপর অনেক দিন কেটে গেল। একদিন ছেলেটিকেও এনে বিশেষ অপরাধীদের কয়েদে ঢোকানো হলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। জিজ্ঞেস করলাম আমাকে সে চিনতে পেরেছে কি না। সে বলল, 'জি ভাই, আপনাকে চিনেছি। আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন। আপনার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণের পর আমি প্রতিনিয়ত মায়ের জন্য ক্ষমা চাই। এখন আমি সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতে কখনো অবহেলা করি না।'

আমি দেখলাম সে সত্য বলছে। সে সবসময় সালাত আদায় করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে। প্রতি সাত দিনে একবার

কুরআন খতম করে। আল্লাহ এবং মায়ের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য সে সব কিছু করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত মোতাবেক প্রতিনিয়ত সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত। একদিন কেউ তাকে বলল, একজন হাফিযের মা-বাবার মাথায় কিয়ামতের মাঠে উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে।১ [[১] এটি মুআয জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, যা সুনান আবী দাউদ বর্ণনা করেছেন।]

তৎক্ষণাৎ সে আমার কাছে এসে কথাটির সত্যতা জানতে চাইল। আমি বললাম, 'একদম সত্যি কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এমনটাই বলা হয়েছে।'

তারপর সে প্রশ্ন করল, 'আমার পক্ষে কি এই মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ ভাই, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করো। আল্লাহর রাহমাত পাওয়ার আগে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণও কলুষিত, দুশ্চরিত্র এবং কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন; কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে তাদের ওপর রহম করেছেন। এরপর তারা হয়ে যান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের আগের সব গুনাহ তিনি মাফ করে দিয়েছেন। তাই কেউ যদি সবচেয়ে বড় গুনাহ করেও আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর ক্রোধের ওপর তাঁর দয়া বিজয়ী হবে।'

আমি খেয়াল করলাম আমার কথাগুলো শুনে ছেলেটির চোখে পানি চলে এলো। সে বলল, ‘ভাই, আমার পাপ শুধু বড়-ই না, অনেক বড়। আমি কোনো সাধারণ মানুষকে হত্যা করিনি। আমি আমার মাকে হত্যা করেছি। সেই মা, যিনি আমাকে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছিলেন, বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছিলেন...’

কথাগুলো বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল। আমি তাকে বললাম, ‘ভাই, তুমি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীসটি শোননি? সৃষ্টির পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দয়াকে একশত ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি নিজের জন্য নিরানব্বই ভাগ রেখেছেন। আর বাকি এক ভাগ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়েছেন। যদি কোনো অবিশ্বাসী আল্লাহর দয়ার পরিমাণ সম্পর্কে জানত, তবে সে জান্নাতে যাওয়ার আশা ত্যাগ করত না। আর কোনো বিশ্বাসী যদি আল্লাহর শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে জানত, তবে সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ মনে করত না।১ [[১] সহীহ বুখারী, আর-রিকাক, হাদীস : ৬৪৬৯; সহীহ মুসলিম, আত-তাওবা, হাদীস : ২৭৫২]

চিন্তা করো, কেবল একভাগ দয়া তিনি সব সৃষ্টির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। সে দয়ার কারণেই পশুরা তাদের বাচ্চাদের স্নেহ করে। কেবল একভাগ দয়ার জন্য কাফিরদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। অথচ তারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় ও আল্লাহর সাথে শিরক করে। তারপরও তারা দুনিয়ায় আল্লাহর অনেক রাহমাত পায়। তারা এই সব রাহমাত পাচ্ছে কেবল একভাগ দয়ার কারণেই। এবার চিন্তা করো,

নিরানব্বই ভাগ দয়া কত মানুষের উপর করা হবে, আর কত মানুষ আল্লাহর ক্ষমা পাবে? বিচারদিবসে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা দেখে শাইতান অপমানিত হবে। সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করেছে, খারাপ কাজে প্ররোচিত করেছে; কিন্তু শেষ দিবসে আন্তরিকভাবে তাওবাকারীদের আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। ফলে শাইতানের সব পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে।’

আমার কথা শুনে ছেলেটির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে কুরআন মুখস্থ করার অঙ্গীকার করল। সে প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করত। এরপর সে অন্যান্য কয়েদীদের তা পড়ে শোনাত। কিছুদিনের মধ্যেই সে হাফিয হয়ে গেল। কুরআনের পাশাপাশি সে হাদীসের বই ও ঈমান বিষয়ক বিভিন্ন বই পড়ত। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতও অধ্যয়ন শুরু করে। সে নিয়মিত তাহাজ্জুদের সালাতও আদায় করে। প্রতি চার অথবা পাঁচ দিনে সে কুরআন খতম করে। হত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সে টানা দুমাস সিয়াম পালন করেছে। এরপর থেকে একদিন পর পর সিয়াম পালন করাটা তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এখন তার নেক কাজের দিকে তাকালে আমার নিজেরই ঈর্ষা হয়।

একদিন সে আমাকে বলল, ‘আমার যদি এখন ফাঁসিও হয়, আমার কোনো আক্ষেপ থাকবে না। মনের ভেতর কোনো কষ্টও থাকবে না। মৃত্যু বরং আমার রবের সাথে সাক্ষাতের একটি সুযোগ তৈরি করে দেবে। আমার জন্য দুআ করবেন ভাই, আল্লাহ যেন আমাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।’

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আমার বিশ্বাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাকে তাঁর ধার্মিক ও ঘনিষ্ঠ বান্দাদের দলভুক্ত করবেন, ইন শা আল্লাহ।'

ছেলেটি বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমি শীঘ্রই দুনিয়ার এই কারাগার থেকে মুক্তি পাব। ভাই, আমাকে এমন একটা উপদেশ দিন—যা জীবনে সাফল্য অর্জনে আমার কাজে আসবে।'

আমি তাকে বারবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে বললাম; কিন্তু সে নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করে আমার কাছে জানতে চাইল এটির ব্যাপারে আমার মতামত কী?

৮৭لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ آيه ﴿﴾

"আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।"১ [[১] আল-আম্বিয়া ২১:৮৭]

আমি বললাম, 'আমার ভাই, তুমি খুব ভালো একটা দুআ পছন্দ করেছ। তোমার উচিত সবসময় এটি পাঠ করা। আশা করি এই দুআর কারণে তোমার প্রতি আল্লাহর দয়া হবে এবং তিনি তোমাকে মাফ করে দেবেন। হ্যাঁ, আরেকটি কথা! শেষ সময়ে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করতে ভুলে যেয়ো না। আর তোমার জিভকে আল্লাহর যিকরে সিক্ত রেখো।'

ছেলেটি কয়েকজন কয়েদীকে কিছু খাবার-দাবার দিল। এরপর সে পরের দিনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। পরদিন সকাল ৭ টায় তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

ফজরের আযানের সময় আমার ঘুম ভাঙল। তখন ছেলেটি ফজরের সালাত আদায় করে যিকর-আযকার করছিল। এরপর তার ফাঁসির সময় চলে এলো। সেই আয়াতটি বারবার পড়তে পড়তে সে আমার সামনে দিয়ে ফাঁসি-কাষ্ঠের দিকে চলে গেল। অন্যান্য কয়েদীরা জানালা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সবাইকে সে সালাম দিল। সে কালিমা১ [[১] আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে—মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল)।] পাঠ করছিল। কারণ সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই হাদীসটি জানত যেখানে বলা হয়েছে, ‘যার শেষ বাক্য হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতী।’২ [[২] সহীহ সুনানু আবী দাউদ, আল-জানাইয, হাদীস : ৩১১৬]

ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুর পূর্বে সে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করল। তারপর নির্ধারিত সময়েই তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো। ফাঁসির কিছুদিন আগে ছেলেটি স্বপ্নে দেখেছিল তার মা বলছেন: ‘আমার সন্তান, আমি তোমার উপর খুশি। আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।’

মাকে পাওয়ার মামলা

একবার দুই ভাইয়ের মধ্যে একটি ব্যাপার নিয়ে বড় ধরনের বিবাদ শুরু হলো। পঞ্চায়েতেও বিষয়টির মীমাংসা করা সম্ভব না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াল বিষয়টি। ঘটনাটি ছিল এমন:

আদালত প্রাঙ্গণে বহু মানুষের ভিড়ে এক বৃদ্ধ আর্তনাদ করে এত বেশি কাঁদছিল যে তার দাড়ি দিয়ে গড়িয়ে অশ্রু ঝরছিল। তার নাম হিজান। সৌদি আরবের একটি শহর বুরাইদা থেকে আরও নব্বই কিলোমিটার দূরে আসিয়া নামক একটি গ্রামে বাস করতেন তিনি।

লোকেরা তাকিয়ে তাকিয়ে তার কান্নারত দৃশ্য দেখতে লাগল। ভাবল, লোকটি এভাবে কাঁদছে কেন? তার ছেলে কি তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে? জমিজমা হাতছাড়া হয়ে গেছে? নাকি বৃদ্ধ বয়সে তার স্ত্রী তাকে তালাক দিয়েছে? এর কোনোটাই নয়; আসল ঘটনা হচ্ছে, একটি মামলায় হেরে যাওয়ায় আদালত প্রাঙ্গণে এভাবে শিশুদের মতো কাঁদছে লোকটি। তার এক বৃদ্ধা মা আছেন। মায়ের না আছে কোনো অর্থ-সম্পদ, না আছে জমিজমা। একটি পিতলের আংটি ছাড়া তাঁর আর কিছুই নেই। অথচ সেই মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব লাভের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে তাদের দ্বন্দ্ব।

বৃদ্ধা মা হিজানের সাথেই থাকতেন। দুভাইয়ের মধ্যে সে-ই বড়। মায়ের সাথে তিনি সদাচরণ করতেন। মায়ের সর্বাত্মক সেবাযত্ন করার চেষ্টা করতেন তিনি। মা তার সাথে খুবই সুখে ছিলেন। ছেলের বয়সও কম

হয়নি। একদিন হিজানের ছোটভাই বড় ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে এলো। সে থাকত অন্য একটি শহরে। বড় ভাইয়ের কাছে সে মাকে নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করল। মূলত মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সে এসেছিল বড় ভাইয়ের কাছে।

ছোট ভাইয়ের কথায় হিজান বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ভাই, আমার বয়স হয়েছে ঠিক; কিন্তু আমি এখনো আমার মায়ের দেখাশোনা করতে সক্ষম। তুমি যদি মনে করে থাকো যে আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি, তাহলে তুমি ভুল করছ। আমি মরে গেলেও মাকে কোথাও যেতে দেবো না। তুমি যদি মাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও, আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। আমার প্রতি দয়া করো ভাই। মাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভুলেও মাথায় এনো না, আল্লাহর দোহাই।'

বড় ভাইটার এমন উত্তরে ছোট ভাই অত্যন্ত নরম কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া, আপনি অনেক দিন থেকে মায়ের সেবাযত্ন করে যাচ্ছেন। আলহামদু লিল্লাহ, আপনি খুব ভালোভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন; কিন্তু আপনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়স হয়েছে আপনার। আপনি নিজেই এখন নিজের সেবাযত্নের জন্য আপনার সন্তানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তাই আমি বলি কি, আপনি এবার আমাদের মায়ের দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন। মাকে আমি আমার কাছে নিয়ে যাই। আমি এখনো শক্ত-সামর্থ্য অবস্থায় আছি। আমার বাচ্চারাও তাদের দাদিকে তাদের সাথে চায়। আমার স্ত্রীও শাশুড়ির সেবাযত্ন করতে চায়। দয়া করে মাকে সেবা করার একটু

সুযোগ আপনি আমাকে দিন। মায়ের জীবনের এই অন্তিম সময়টুকুতেও যদি আমি তার একটু সেবা করার সুযোগ না পাই, তাহলে আমি নিজেকে একেবারেই ক্ষমা করতে পারব না। ভাই আমার, আল্লাহর দরবারে মায়ের হক আদায়ের প্রশ্নে আপনি আটকাবেন না, ইন শা আল্লাহ। এবার মাকে আমার কাছে থাকতে দিন। মায়ের হক আমাকেও একটু আদায় করতে দিন আল্লাহর ওয়াস্তে।'

কিন্তু না, বড় ভাই হিজান কোনোভাবেই মাকে হাতছাড়া করবেন না। মা তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে, সে মায়ের পা টিপে দিতে পারবে না, মাথা টিপে দিতে পারবে না, মাকে ওষুধ খাওয়াতে পারবে না—এসব ভাবতেই যেন তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হচ্ছিল। এরপর দুভাইয়ের মধ্যে এটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। তাদের কেউই মাকে ছাড়তে রাজি নয়। প্রতিবেশীরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের পক্ষে কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। কারণ তারা উভয়ই নিজ নিজ অবস্থানে অনড়। এ অবস্থা দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে যায়। বিষয়টি কিছুতেই সমাধান করা গেল না। সমঝোতার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এরপর দুভাইয়ের অনুরোধে মামলাটিকে উচ্চ আদালতে পাঠানো হয়।

বিচারকের কাছে মামলাটি উত্থাপন করা হলে মামলার বিষয়বস্তু শুনে বিচারক খুবই বিস্মিত হন। তিনি বারবার মামলাটি পড়েন; কিন্তু কোনোভাবেই বুঝতে পারছিলেন না যে কী করা যায়। তারপর তিনি দুই ভাইকে তাঁর চেম্বারে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মামলাটির নিষ্পত্তি করার চেষ্টা

করেন; কিন্তু তাদের কেউই মায়ের সেবাযত্নের ভাগ ছাড়তে রাজি না। বিচারক বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে শুনানির দিন তাদের মাকে আদালতে আনতে বলেন। কারণ তিনিই বলতে পারবেন যে তিনি কোন সন্তানের কাছে থাকতে চান—বড় ছেলের কাছে, নাকি ছোট ছেলের কাছে।

নির্ধারিত দিন একটা হুইল চেয়ারে করে বৃদ্ধা মাকে আদালতে আনা হলো। বৃদ্ধার কঙ্কালসার দেহের ওজন ২০ কেজির খুব বেশি হবে না। আদালতভর্তি লোকজন। এই আজব মামলার রায় শোনার জন্য উৎসুক লোকেরা অস্থির হয়ে আছে।

বিচারক বৃদ্ধাকে বললেন, 'শ্রদ্ধেয় মা, আপনার দুই ছেলেই আপনাকে কাছে রেখে সেবাযত্ন করতে চায়। তাদের কেউই আপনার কাছ থেকে আলাদা হতে চায় না। আমি তাদেরকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থানে অনড়। মামলাটির রায় নিয়ে আমি সমস্যায় পড়েছি। আমি কোনো রায় দিতে পারছি না। তাই আপনার হাতেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম। আপনার ইচ্ছেনুযায়ীই আমি রায় দেবো। আপনিই বলুন, আপনি কার সাথে থাকতে চান?'

সত্যি বলতে, এই বিষয়ে রায় দেওয়া একজন বিচারকের জন্য যতটা জটিল, একজন মায়ের কাছে তার চাইতেও হাজারগুণ কঠিন। দুসন্তানই তাঁর চোখের মণি। তিনি দুজনকে সমান ভালোবাসেন। একই গর্ভে তিনি দুজনকে ধারণ করেছেন। একই উদর থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদের মাঝে পৃথিবীর কোনো মা-ই কি পার্থক্য করতে পারে? দুজনই তাঁর সেবাযত্নে অনেক

আন্তরিক। বিচারক যখন বৃদ্ধার কাছে বিচারের ভার দিয়ে দিলেন, তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। বিচারক অধৈর্য হয়ে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা মা মুখ খুললেন। তাঁর চোখ দিয়ে তখন অশ্রুর ফোয়ারা নেমে এলো।

তিনি বললেন, 'মাননীয় বিচারক, আমি কী বলব বলুন? আমি ওদের মা। ওরা দুজনই আমার সন্তান। ওরা দুজন আমার এই দুই নয়নের মণি। একই উদরে জন্ম নেওয়া দুই সন্তানের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়াটা পৃথিবীর যেকোনো মায়ের জন্যই অসম্ভব রকমের কঠিন। এ অবস্থায় আমার পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়।'

মায়ের এমন বক্তব্যে বিচারকাজ আরও কঠিন হয়ে গেল; কিন্তু বিচারককে একটি রায় তো দিতেই হবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে তিনি ঘোষণা করলেন, 'হিজান অনেক দিন ধরে তার মায়ের সেবা করেছে। এখন সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তার নিজেরই এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর দেখভালের প্রয়োজন। হিজানের তুলনায় তার ছোট ভাই এখনো তরুণ এবং শক্ত-সামর্থ্য। মায়ের দেখাশোনা করতেও সে সক্ষম। তাই আদালত এই রায় দিল যে এখন থেকে বৃদ্ধা মা তার ছোট ছেলের সাথেই থাকবে।'

এই রায় শোনামাত্র বড় ছেলে হিজান কষ্টে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এত লোকের সামনে আদালতে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'হায় আফসোস! আজকে আমি বয়সে ছোট হলে মাকে সেবা করার সৌভাগ্যটা আমারই হতো।'

আত্মত্যাগ

ছেলেটি সৌদি আরবে একটি ভালো চাকরি করে। দেশে হঠাৎ করেই তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটায় তিনি নড়াচড়া ও কাজ করতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েন। দেশে তাঁর সুচিকিৎসা সম্ভব নয়।

ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিলেন। তাঁরা জানিয়ে দিলেন সেখানে রোগী সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে তিনি কখনোই আর আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন না। তিনি আজীবন শয্যাশায়ীই থাকবেন। কখনো নড়াচড়া করতে বা হাঁটতে পারবেন না। কখনো কথাও বলতে পারবেন না।

ডাক্তারদের কথা শুনে ছেলেটির পরিবারের সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তারা চিন্তা করতে লাগল বিদেশে চিকিৎসা চলাকালে বাবাকে কে দেখাশোনা করবে? এত দীর্ঘ সময় কে তাঁর সাথে বিদেশে পড়ে থাকবে? সবারই তো কাজ আছে। সন্তানদের মধ্য থেকে তখন একজন বলে উঠল, ‘ভাইয়েরা, চিন্তা করো না। আমি থাকব বাবার সাথে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাবা যতদিন জীবিত থাকবেন, আমিই তাঁর দেখাশোনা করব।’

বৃদ্ধের চার সন্তানের মধ্যে এই ছেলেটি সবার ছোট। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মাঝামাঝি। বিদেশে ভালো একটা চাকরি করত সে। তাছাড়া সে বিয়ে পর্যন্ত করেনি তখনো। তাই তার কথায় অন্য ভাইয়েরা শঙ্কিত হলো

যে বাবার করুণ অবস্থা দেখে আবেগের বশে হয়তো তাদের ছোট ভাইটি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু সে এই অঙ্গীকার পূরণ করতে পারবে না। তারা ভাবল সে তো বিদেশে খুব ভালো পোস্টে চাকরি করে। সে যদি অসুস্থ বাবার সেবাযত্ন করতে যায়, তাহলে তার চাকরির কী হবে? তার সারা জীবনের স্বপ্ন, ক্যারিয়ার, দূরদূরান্তে বেড়াতে যাওয়ার তার যে শখ—সেগুলোর কী হবে? বাবার চিকিৎসায় হয়তো বহু বছর লেগে যাবে। সে কি তার যৌবন, আশা-স্বপ্ন সবকিছুকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?

বড় ভাইয়েরা নানাবিধ বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও ছোট ভাই তাদেরকে বুঝিয়ে রাজি করালো; অতঃপর সে সবকিছু ছেড়েছুড়ে বাবাকে নিয়ে বিদেশে চলে এলো। এই ভিনদেশে অনুগত সন্তানই বাবার একমাত্র অবলম্বন। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর থেকে সে সাধ্যমতো বাবার সেবাযত্ন করেছে। সময়মতো ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে, গোসল করিয়েছে, খাবার খাইয়েছে। বাবা ঘুমানোর পর ছেলেটি বিছানায় পিঠ লাগাত। বাবা ঘুম থেকে ওঠার আগে আগেই সে উঠে পড়ত।

একটি সপ্তাহ, একটি মাস বা একটি বছর নয়; দীর্ঘ তেরোটি বছর নিরলস সে বাবার সেবা করে গেছে। বাবার সাথে সে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করত, শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। কখনো বুঝতে দেয়নি যে বাবার সেবা করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও ক্লান্তি বা বিরক্তির ছাপ তার মুখে ফুটে ওঠেনি।

বাবাও ছিলেন সন্তানের প্রতি কৃতজ্ঞ; কিন্তু কথা বলতে অক্ষম হওয়ায় তিনি কখনোই নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেননি। ভালোবাসার দৃষ্টিতে ছেলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন কেবল। এভাবে অসুস্থতায় ভুগতে ভুগতে একদিন তিনি মারাই গেলেন।

হাসপাতালের ডাক্তার থেকে নার্স, আয়া থেকে বুয়া সবাই ছেলেটিকে চিনত। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে সে বাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করে আছে। এই হাসপাতালের ইট-পাথরও সম্ভবত তাকে চেনে; কিন্তু এখন সে মধ্যবয়সী। চল্লিশোর্ধ্ব বয়স তার। কোনো চাকরি নেই, স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, নেই কোনো ভবিষ্যৎ। এই দীর্ঘ সময়ে সে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার আত্মত্যাগের কথা কে-ই বা মনে রাখবে?

দুনিয়ায় হয়তো তার এই ত্যাগের স্বীকৃতি দেওয়ার কেউ নেই; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো আছেন, তিনি তো ন্যায়বিচারক। তিনি কারও বিন্দু পরিমাণ কর্মফলও বিনষ্ট করেন না। তিনি অবশ্যই ছেলেটার এই কাজে সন্তুষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি তাকে এর উত্তম পুরস্কার দেবেন।১ [[১] এই গল্পটি আল-উসরাহ পত্রিকার ১৮০তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরও অনেকগুলো পত্রিকায় প্রকাশ পায়। Encyclopedia of Story থেকে বিস্তারিত ঘটনাটি নেওয়া হয়েছে।]

উপলব্ধির গল্প : আর কি পাবো তারে!

লোকটি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধনী এবং সর্বক্ষেত্রে একজন সফল মানুষ। তাঁর সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও ছিল অনেক। সবাইকে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করেছেন তিনি। ভালো জায়গায় বিয়ে করিয়েছেন। ভালো পরিবার আর ভালো পাত্র দেখে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক ছেলে স্ত্রী নিয়ে আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকে। বিশাল বাড়িতে থাকতেন কেবল দুজন—বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা। তাদের দেখাশোনা করার জন্য ছিল একজন ড্রাইভার আর একজন কাজের মেয়ে। মা-বাবার একাকিত্ব দূর করতে সন্তানরা ছুটির দিনটাই কেবল তাদের সাথে কাটাত।

নাতি-নাতনিরা একটু বড় হয়ে উঠলে তাদের সাথে বৃদ্ধ দম্পতি বেশ ভালো সময় কাটাতে শুরু করল। বছর কয়েক যেতে-না-যেতেই একদিন হঠাৎ করে বৃদ্ধা মা মারা গেলেন। স্ত্রীকে হারিয়ে বৃদ্ধ বাবা একেবারে একাকী হয়ে পড়েন। চারদিকে যেন কেমন একটা শূন্যতা কাজ করত। সারা বাড়িময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাদের এতদিনকার স্মৃতিবিজড়িত নানারকম জিনিস। সেগুলো চোখে পড়লেই বৃদ্ধ বাবার বুকটা হাহাকার করে ওঠে। জীবনের কতগুলো বছর তারা একসাথে পার করে এসেছেন। জীবন-সায়াহ্নের সময়টাতে স্ত্রী তাঁকে একা রেখেই পাড়ি জমালেন ওপারে। এত বড় বাড়িতে

একাকী থাকাটা একপর্যায়ে তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। এরপর একদিন তিনি বড় ছেলেকে জানালেন যে তিনি ছেলের সাথেই থাকতে চান।

বাবার এহেন প্রস্তাবে বড় ছেলে খুব খুশিই হলো। এতদিন মা থাকায় বাবার একজন সঙ্গী ছিল। এখন তো মা নেই, তাই বাবা যদি জীবনের বাকি সময়টুকু তাদের সাথে কাটান সেটা তো ভালোই। উৎফুল্ল হয়ে ছেলে বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়ির একটি কক্ষ বাবার জন্য ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হলো। বাবার সেবাযত্নের যাতে কোনোরূপ ত্রুটি না হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার পর ছেলে বাবার সাথে দেখা করে স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেয়। কোনোকিছু লাগবে কি না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না—ইত্যাদি ব্যাপারে ছেলে খুব যত্ন নিতে থাকে। বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটছিল বাবার দিনগুলো।

কিন্তু হায়! এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না বৃদ্ধ বাবার কপালে। ক্রমে পুত্রবধূ তার শ্বশুরের উপর বিরক্ত হতে থাকল। বৃদ্ধের সাথে খারাপ আচরণ করতে শুরু করল। ক্লান্ত হয়ে স্বামী বাড়ি ফিরলে সে শ্বশুরের নামে নানারকম নালিশ দিত। এভাবে ছেলের মনও একটা সময় বাবার প্রতি বিষিয়ে ওঠে। বাবাকে বাড়ি থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য স্ত্রী প্রতিনিয়ত চেঁচামেচি করতে থাকে। এমনকি সে একথাও বলল, “তুমি ঠিক করে বলো, তুমি কাকে ছাড়বে—আমাকে, না তোমার বাবাকে?”

স্ত্রীর এই কথায় সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে সে অনেক বেশি ভালোবাসে। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয় বাবাকে চিলেকোঠার

ছোট্ট ঘরটিতে পাঠিয়ে দেবে। এতে স্ত্রীরও মনরক্ষা হবে, আর বাবাও ততটা কষ্ট পাবেন না।

সে এরপর বাবাকে গিয়ে বলে, 'বাবা, অনেক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলাম তোমাকে উপরের ঘরটিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। উপরে অনেক আলো-বাতাস আছে। আশা করছি সেখানে খোলামেলা পরিবেশে তোমার আরও বেশিই ভালো লাগবে।'

অসহায় পিতা ছেলের কথায় কোনো প্রতিউত্তর না করে নরম কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি আসলে ঠিকই বলেছ। আমি তোমার কথায় আপত্তি করছি না। চিলেকোঠার ঘরে গেলেই মনে হয় আমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আমি বরং সেখানেই চলে যাই। নিচতলায় তো কোনো আলো-বাতাস আসে না তেমন, এখানে কেমন যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।'

নিচতলায় থাকাবস্থায় তিনি নাতিদের সাথে অনেক মজা করতেন, গল্প করতেন; কিন্তু চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে তিনি আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যান। কথা বলার মতো কাউকে পান না। ছেলের বউয়ের কড়াকড়িতে নাতি-নাতনিদের কেউই তাদের দাদার ঘরে আসতে পারত না। চিলেকোঠার ঘরে একরকম বন্দি হয়ে পড়লেন তিনি।

বৃদ্ধ বাবা ছেলে আর ছেলের বউয়ের অবহেলা চুপচাপ সহ্য করতে লাগলেন। দুঃখে তিনি ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু কোনোদিন নিজের কষ্ট প্রকাশ করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পিতার জন্য তাদের অন্তরে কোনো সহানুভূতি নেই। অন্যথায় বাড়িতে এত

দামি দামি প্লেট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একটি প্লাস্টিকের প্লেটে খেতে দেওয়া হতো না; কাজের মেয়েকে ছেলের বউ বলত না— "খবরদার, তাকে কাঁচের প্লেটে দিবি না। এই প্লাস্টিকের প্লেটে খেতে দিবি। সে কাঁচের প্লেট ভেঙে ফেলবে।"

এসব শুনে বৃদ্ধ বাবা ভীষণ ব্যথিত হন। যে সন্তানদের জন্য তিনি নিজের সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছেন, তাদের থেকে এমন নির্মম আচরণ পেতে হবে কখনো তিনি তা কল্পনাও করতে পারেননি।

বৃদ্ধ বাবার জীবন ফুরিয়ে আসতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর আর বেশিদিন বাঁচা হবে না। বাড়িতে এত মানুষ, অথচ তাঁকে দেখাশোনা করার কেউ নেই। তাঁর পোশাক ময়লা হয়ে গেছে। ঘর নোংরা হয়ে আছে। তিনি বড় একা, বড় অসহায়। যেন জীবিত থেকেও তিনি মৃত। এর কিছুদিন পর শেষ নিঃশ্বাসটুকুও তিনি ত্যাগ করলেন। চিলেকোঠার কোণায় পড়ে রইল তাঁর নিথর, নির্জীব দেহ।

বাবার মৃত্যুর পরে চিলেকোঠার ঘরটি খালি হয়ে পড়ে। ছেলের বউ ভাবল ওই ঘরে তো ড্রাইভারকে থাকতে দেওয়া যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। এক ছুটির দিনে বড় ছেলে তার আট বছরের সন্তানকে নিয়ে চিলেকোঠার ঘরটিতে গেল। সাথে বুয়াকেও নিয়ে গেল ঘরটি পরিষ্কার করার জন্য। বাবার হাত ধরে চিলেকোঠার ঘরে আসা শিশুটি ধুলার মধ্য থেকে দাদার প্লাস্টিকের প্লেটটা খুঁজে বের করে হাতে নিল।

বাবা বলল, ‘বাবু, ফেলে দাও ওটা। এই নোংরা প্লেট রাখার কোনো দরকার নেই।’

কিন্তু শিশুটি কিছুতেই বাবার কথায় রাজি হলো না। সে বলল, ‘না না, এটা আমি ফেলব না; আমার দরকার এটা।’

বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘এই নোংরা প্লেট দিয়ে কী করবে তুমি?’

শিশুটি তখন বলল, ‘আমি এটা যত্ন করে রেখে দেবো। তুমি যখন দাদুর মতো বুড়ো হবে, তখন এটাতে করে তোমাকেও খাবার দেবো।’

অবুঝ শিশুর মুখ থেকে এমন কথা শুনে তার বাবা বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল যে তার নিজের বাবার সাথে সে মোটেও ভালো আচরণ করেনি। তার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে তার চারপাশ যেন অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। সে তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে লাগল কত বড় ভুল হয়ে গেছে তার। কাজ বন্ধ করে দিয়ে সে বাবার বিছানায় হাত বুলাতে লাগল। চুমু দিতে লাগল। এক অসহায় সন্তানের মতো সে হাতড়িয়ে বাবাকে খুঁজতে লাগল; কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।১ [[১] শাইখ মুহাম্মদ আল-আরাইফির সংগ্রহ থেকে ঘটনাটি নেওয়া হয়েছে। এটি ইন্টারনেটেও পাওয়া যাবে।]

কিছু স্মৃতি, কিছু শূন্যতা

বিয়ের পর একুশটা বছর কেটে গেছে। এখন আমি তিন সন্তানের বাবা। ব্যবসা ও ঘর-সংসার নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। তাই বন্ধুদেরও খুব বেশি সময় দেওয়া হয় না।

এত ব্যস্ততার পরও আমার মাকে আমি সময় দিতাম। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে মাকে দেখতে যেতাম। প্রায়ই ফোন করে খোঁজখবর নিতাম তাঁর। মা হচ্ছেন দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। কেউ যদি আন্তরিকভাবে মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতী হবে।

হঠাৎ করেই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অনেকদিন হয় মাকে দেখি না। ফোন করি, টুকটাক কথা বলি; তবে আগের মতো নিয়মিত না।

একদিন মনে হলো আমি মায়ের প্রতি অবহেলা করছি, এটা ঠিক হচ্ছে না। আর যাই হোক, মা-ই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সম্পদ। দুনিয়ালাভের জন্য আমি আমার মাকে যদি অবহেলা করি, তাহলে আল্লাহও আমার ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বরকত উঠিয়ে নেবেন। মায়ের প্রতি যেমন দায়িত্বশীল হওয়ার কথা তেমনটা হতে পারছি না ভেবে একটা অপরাধবোধ জেগে উঠল মনে। তখনই মাকে ফোন করে বললাম: ‘মা, চলো তো আজ রাতে দুজন একসাথে বাইরে কোথাও খাই।’

এই প্রস্তাবে আমার মা খুব অবাক হলেন। কারণ এভাবে কখনো মাকে নিয়ে বাইরে খাওয়া হয়নি আমার। তিনি ভাবলেন হয়তো কোনো বিপদ হয়েছে আমার। খুব বিপদে পড়লে ছেলেরা মায়ের সঙ্গ চায় বেশি। মায়ের কাছে সমস্যার কথা বলতে পারলে যেন সন্তানদের বুক হালকা হয়। মা বললেন, ‘বাবা, তোর কি কোনো সমস্যা হয়েছে?’

আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাহমতে আমি ভালো আছি মা। আমার কিছুই হয়নি। আমি শুধু তোমার সাথে খেতে চাইছি আজ রাতে। তোমার আঁচলের তলে কিছুটা সময় কাটাতে চাই। তোমার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করতে চাই। আর কিছু না।’

তিনি বললেন, ‘আমারও তোর সাথে খেতে খুব ইচ্ছে করে। আচ্ছা বাবা, সন্ধ্যায় আমি তোর জন্য অপেক্ষা করব।’

সন্ধ্যায় যখন মাকে রিসিভ করতে গেলাম, দেখি তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। আল্লাহই জানেন কখন থেকে তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি হেসে বললেন, ‘জানিস, সবাইকে বলেছি ছেলের সাথে আজ বাইরে খেতে যাচ্ছি। শুনে তারা এত খুশি হয়েছে যে বলার মতো না।’

তারপর মাকে নিয়ে একটি নামি-দামি হোটেলে গেলাম। মা আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসালেন। আমি খাবারের তালিকায় চোখ বুলাচ্ছিলাম আর মা একদৃষ্টিতে আমাকে দেখছিলেন। তাঁর চোখে-মুখে ছিল গভীর মমতার ছাপ।

তিনি বললেন, 'তুই যখন খুব ছোট ছিলি, আমিও তোকে বাইরে খেতে নিয়ে যেতাম। আমিও ঠিক তোর মতো মেনু দেখতাম আর তুই পাশে বসে থাকতি; কিন্তু এখন তুই মেনু দেখছিস আর আমি তোর দিকে তাকিয়ে আছি। সময় কত দ্রুত চলে যায় না রে?'

আমি বললাম, 'হুম।'

খাওয়া-দাওয়ার পর কাউন্টারে গিয়ে আমি বিল পরিশোধ করে এলাম। তারপর সেখানে বসেই মায়ের সাথে গল্প করলাম। কত কথা, কত স্মৃতি! বিশেষ করে ছোটবেলায় মায়ের সাথে আমার মজার স্মৃতিগুলোর কথা। মনে হচ্ছিল আমি আবার ছোট্ট শিশু হয়ে গিয়েছি। মা তাঁর ভালোবাসা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি অনেক রাত হয়ে গেছে। কথায় কথায় কখন যে এতটা সময় চলে গেছে বুঝতেও পারিনি!

মা বললেন, 'বাবা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন বাড়ি যাওয়া উচিত।'

মাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার সময় মনে হচ্ছিল বহু মূল্যবান সম্পদ ছেড়ে দিতে যাচ্ছি। মাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিলাম।

তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বাবা, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি তোকে। এরপর কখনো একসাথে খাওয়ার সুযোগ পেলে বিলটা কিন্তু আমিই দেবো।'

মায়ের কথা শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল। মাকে চুমু খেয়ে দ্রুত গাড়িতে উঠে বসলাম। পরদিন আমার স্ত্রী-সন্তানদের সব ঘটনা বললাম।

এর অল্প কিছুদিন পর খুব অপ্রত্যাশিতভাবে আমার মা মারা যান। মা হঠাৎ করে এভাবে চলে যাওয়ায় আমি খুব কষ্ট পেলাম। মায়ের জন্য আরও অনেক কিছু করতে চেয়েছিলাম। ভাবতেও পারিনি তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। যে হোটেলে মায়ের সাথে খেয়েছিলাম, একদিন সেখান থেকে একটা চিঠি এলো। খাম খুলে দেখি মায়ের হাতের লেখা। চিঠিটা পড়ে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। চিঠিটা বারবার পড়ি। অমূল্য রতনের মতো নিজের কাছে আগলে রাখি। চিঠিতে মা লিখেছিলেন:

‘আমার সন্তান, মনে হয় আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। তোর আর বৌমার জন্য সেদিনের রেস্টুরেন্টটায় অগ্রিম বিল দিয়ে গেলাম। তোরা দুজন হোটেলে গিয়ে কোনো একদিন খেয়ে নিস। সেদিন তোর সাথে খেতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। মন খুলে কথা বলতে পেরে আরও বেশি ভালো লেগেছে। বাবা, তোকে আমি অনেক ভালোবাসি।’

আজ স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই আছে। এরপরও একটা শূন্যতা রয়ে গেছে বুকের ভেতর। গভীর শূন্যতা।

পুরস্কার

ঘটনাটি এক আরব যুবকের। কোনো এক কারণে হঠাৎ সে তার চাকরিটা ছেড়ে দেয়। তখন অফিস থেকে সে কিছু নগদ অর্থ পায়; সাকুল্যে বত্রিশ হাজার দিনার। চাকরি ছাড়ার পরে বলা চলে সেই অর্থটুকুই ছিল তার একমাত্র সম্বল।

হজের কিছুদিন আগের ঘটনা। হজযাত্রীরা তখন হজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ছেলেটি যখন বাড়িতে এসে তার বাবা-মাকে অফিস থেকে প্রাপ্ত টাকার কথা জানাল, তারা আবদার করলেন, 'বাবা, আমরা চাই এই টাকা দিয়ে তুমি আমাদেরকে হজ আদায় করাও।'

ছেলের কাছে বাবা-মা একটা আবদার করল আর ছেলে সেটা রাখবে না? ছেলেটি কোনো রকম দ্বিধা না করে সাথে সাথে বলল, 'ঠিক আছে, এবার আপনাদের দুজনকেই হজে পাঠাবো, ইন শা আল্লাহ।'

যদিও ওই মুহূর্তে টাকাগুলোর খুব দরকার ছিল তার; তবুও পিতা-মাতার ইচ্ছেকে সম্মান না করে পারল না। এরপর ছেলেটি নিজেই একটা ট্রাভেল এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে তাদের হজে যাওয়ার সকল বন্দোবস্ত শেষ করল। অবশেষে বাবা-মায়ের হজে যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল। হজ সম্পন্ন করে দুসপ্তাহ পর তারা বাড়িও ফিরলেন।

যদিও সে সময়ে ছেলেটির আর্থিক অবস্থা ছিল নিতান্তই খারাপ, তবুও টাকার জন্য তার কোনো আফসোস ছিল না; বরং বাবা-মায়ের আবদার

রক্ষা করতে পেরে এক ধরনের ভালোলাগা কাজ করছিল তার মধ্যে। এভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একদিন আগের অফিসের ম্যানেজার তাকে ফোন করে জানালেন যে দীর্ঘদিন চাকরি করার সুবাদে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সে এককালীন কিছু টাকা পাবে এবং অনুরোধ করলেন সময়মতো টাকাটা উঠিয়ে নিতে।

ছেলেটি ভাবল অল্প কিছু টাকা পাওয়া যাবে হয়তো। কারণ আগেও সে টাকা নিয়েছে; কিন্তু সেই অল্প টাকাও তার কাছে অনেক কিছু। এরপর সে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করল। তিনি একটি খাম হাতে দিলেন। ছেলেটি ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি চলে এলো। বাড়িতে এসে খামটি ছিঁড়ে ভেতরে একটি চেক দেখতে পেল। অবাক হয়ে সে দেখল, বাবা-মায়ের হজের জন্য যে পরিমাণ দিনার সে খরচ করেছে, এখানে ঠিক সে পরিমাণ দিনারই তাকে দেওয়া হয়েছে। ছেলেটি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। সত্যি তিনি মহিমান্বিত।

স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন

দুনিয়ায় মহিলাটির রক্তসম্পর্কের বলতে কেবল একটি সন্তানই আছে। সর্বহারা মায়ের কাছে সেই সন্তানই যেন অন্ধের যষ্টি। মৃত্যুশয্যায় স্বামী একটি ছোট্ট ঘর ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি তাদের জন্য। সেটাও ছিল কোনো রকম মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই মাত্র।

একমাসের ছোট্ট শিশুকে রেখে তাঁর স্বামী ইন্তেকাল করেন। এরপর থেকে মায়ের সবকিছুই ছিল সেই সন্তানকে ঘিরে। মায়ের দুনিয়া বলতে কেবল সন্তানটিই। সন্তানকে লালন-পালন ও পড়াশোনা করাতে গিয়ে তিনি হাসিমুখে সকল কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছেন।

একটু বড় হওয়ার পর শিশুটি যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করল, মায়ের আনন্দের সীমা রইল না। আদরের সন্তানকে তিনি পরম মমতায় প্রতিদিন স্কুলে দিয়ে আসতেন, আবার ছুটির পর গিয়ে নিয়ে আসতেন। মায়ের চোখের সামনে দিয়ে ছোট্ট শিশুটি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। একদিন সে ছুটে এসে মায়ের হাতে তুলে দিল মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট। সেটা হাতে নিয়ে মায়ের সে কী আনন্দ! বাঁধভাঙা খুশিতে তিনি কেঁদেই ফেললেন। ছেলেকে ঘিরে মায়ের কত শত স্বপ্ন। ছেলে বড় হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে। সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এই দৃশ্য দেখে দুঃখিনী মা তাঁর সকল কষ্ট-যাতনা মুহূর্তেই ভুলে যাবেন।

ছেলেটি পড়াশোনায় ভালো করতে লাগল। একসময় সে শহরের নামকরা কলেজ থেকে পাস করে বের হলো। এরপর ছেলেটি একদিন খুব খুশি হয়ে মাকে জানাল যে সে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে বলে সরকার তাকে বিদেশে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি দিয়েছে। সে বিদেশে গিয়ে অনেক উচ্চ ডিগ্রি নেবে। তারপর মাকে আর কোনো কষ্টই করতে হবে না।

মায়ের মনে একমাত্র কলিজার টুকরাকে ছাড়তে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবুও শুধু সন্তানের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি রাজি হলেন। তিনি সবসময় স্বপ্ন দেখতেন যে তাঁর সন্তান উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে অনেক বড় মানুষ হবে। সমাজের সবাই তাঁকে সম্মান করবে।

অবশেষে মাকে ছেড়ে দূরদেশে পাড়ি দেওয়ার সময় চলে এলো। বাড়ির বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। মা ছেলের ব্যাগ গুছিয়ে দিলেন। প্রয়োজনীয় সবকিছু ঠিকমতো আছে কি না বারবার করে দেখলেন। মায়ের অন্তরটা ফেটে যাচ্ছিল; কিন্তু তিনি নিজেকে শক্ত করে রাখলেন। তিনি হাসিমুখে সন্তানকে বিদায় দিতে চান। বাড়ির দরজা পর্যন্ত সন্তানকে এগিয়ে দিলেন মা। ছেলে গাড়িতে উঠে বসল। যতদূর পর্যন্ত গাড়ি দেখা গেল মা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর একমাত্র নাড়িছেঁড়া ধন আজ তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে ভাবতেই ছেলের জন্য ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মা। ছেলেকে নিজের চোখের আড়াল হতে দেওয়ার যে কী কষ্ট—সেটা গর্ভধারিণী মায়ের চেয়ে কে আর বেশি উপলব্ধি করতে পারে?

ছেলেটি বিদেশে পৌঁছেই মায়ের কাছে চিঠি লিখল; কিন্তু মা তো পড়াশোনার কিছুই জানতেন না। কিন্তু তাতে কী? তিনি চিঠির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু অক্ষরগুলো দেখতেন। আহা! চিঠিজুড়েই ছেলের হাতের স্পর্শ লেগে আছে—এটা ভাবতেই মায়ের মন ভরে উঠছিল। তিনি হাত দিয়ে অক্ষরগুলো স্পর্শ করেন, চুমু খান। ছেলের জন্য এমন পাগলামি হয়তো মায়েরাই করে থাকেন। ছেলের চিঠিটা একটিবার পড়ে শোনানোর জন্য কত মানুষের কাছে তিনি গেছেন। ছেলের কাছে চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য তিনি প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করতেন।

সময় খুব দ্রুত কেটে গেল। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর পেরিয়ে গেল। মায়ের শরীরে আগের মতো আর জোর নেই। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। একদিন চিঠি এলো ছেলে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছে। এই সুখবরে তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। যাকে পান তাকে ধরেই এই খবর দেন। এরপর আরও বেশ কিছু দিন কেটে গেল এভাবে।

এক সকালে দরজার কড়া নাড়ানোর শব্দ হলো। বৃদ্ধা মা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তিনি শুনতে পেলেন না। শব্দটি প্রবল হলে তাঁর ঘুম ভাঙে। তিনি উঠে গিয়ে দরজা খোলেন। ইংরেজদের পোশাক পরিহিত এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। মা ঝাপসা চোখে ভালো বুঝতে পারছিলেন না। ভালো করে খেয়াল করে দেখলেন, এ তো তাঁরই সন্তান! তাঁর কলিজার টুকরা! কতগুলো

বছর তিনি ছেলেকে দেখেননি। কত বড় হয়ে গেছে ছেলেটা! মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এরপর কত রকম গল্প। ছেলের অবর্তমানে যা যা ঘটেছে সবকিছু মা বললেন। ছেলেও বিদেশের বিভিন্ন ঘটনা মাকে শোনাল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দিন ফিরে গেল। ছেলেটি ভালো বেতনের চাকরি পেল। মায়ের অনুমতি নিয়ে ছেলেটি তাদের জরাজীর্ণ পুরোনো ঘরটি বিক্রি করে অভিজাত শহরে সুন্দর একটি বাড়ি কিনল।

মা এখন অনেক খুশি। তিনি ছেলেকে বিয়ে করিয়ে নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চান। ছেলে বিদেশে থাকতে মা মনে মনে একটা মেয়েও ছেলের জন্য পছন্দ করে রেখেছেন। মেয়েটি বেশ শালীন, নম্র ও ভদ্র। অনেকদিন যাবত তিনি মেয়েটিকে দেখছেন। তিনি ছেলেকে মেয়েটির কথা বললেন; কিন্তু ছেলে বলল সে এখনই বিয়ে করতে চায় না। মা তাকে অনেক বুঝিয়ে বললেন যে এমন মেয়েকে হাতছাড়া করা উচিত হবে না। এই মেয়েটি অন্য দশটি মেয়ের মতো নয়। সে মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করে না; কিন্তু ছেলে কিছুতেই মায়ের কথায় রাজি হলো না। মা মনে কিছুটা আঘাত পেলেন; কিন্তু তিনি ছেলেকে কিছুই বললেন না।

একদিন ছেলেটি এসে মাকে বলল সে একটি মেয়েকে পছন্দ করে। তাকেই সে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটি এক বিশিষ্ট ধনী লোকের কন্যা। মা সম্মতি দিলেন। অনেক ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল তাদের। বাড়িতে এলো সুন্দরী নববধূ; কিন্তু সে ছিল দাম্ভিক ও উদ্ধত প্রকৃতির। শাশুড়ির সাথে সে মোটেও

ভালো আচরণ করত না; কিন্তু ছেলে যখনই মায়ের কাছে তার স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাইত, মা বলতেন— "সে খুব ভালো মেয়ে। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে।" সত্যি কথা বলে সন্তানের মনে আঘাত দিতে চাননি তিনি। চাননি ঘরে কোনো অশান্তির সৃষ্টি হোক।

কিন্তু বউয়ের আচরণ দিন দিন খারাপ হতে থাকে। একসময় মায়ের প্রতি ছেলেরও খেয়াল কমে যায়। তার রুটিন হয়ে দাঁড়ায়—প্রতিদিন অফিসে যাওয়া, সেখান থেকে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে সময় দেওয়া, এরপর খেয়ে ঘুমাতে যাওয়া। মায়ের জন্য ছেলের কাছে কোনো সময়ই ছিল না। ক্রমেই মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা কমে যেতে থাকে। এমনকি পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে সারাদিনে একবারও সে মায়ের কথা ভাবত না।

একদিন স্ত্রীর বান্ধবীরা বাড়িতে বেড়াতে আসবে বলে ছেলেটি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে চলে আসে। বৃদ্ধা মা তখন তাঁর দুর্বল দুখানা হাত দিয়ে নিজের কাপড় ধুচ্ছিলেন। ছেলে গোসলখানার দরজায় এসে দাঁড়াল। পেছনে স্ত্রী। সে মাকে বলল, "তোমাকে একটা কথা বলার জন্য অফিস থেকে আমি তাড়াতাড়ি এসেছি। শোনো, আজকে আমার স্ত্রীর বান্ধবীরা আমাদের বাসায় আসবে। তারা এখানে খাওয়া-দাওয়া করবে। আমার স্ত্রীর মর্যাদা রাখতে তোমার ভালো একটা কাপড় পরিধান করা উচিত। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তাদের সাথে গিয়ে আবার বোসো না যেন। এটা আমার ও আমার স্ত্রীর সম্মানের প্রশ্ন।"

কথাগুলো মায়ের কাছে বজ্রধ্বনির মতো লাগল। তিনি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তিনি এতদিন সব কষ্ট সহ্য করেছেন। এই সেই সন্তান! তাকে বড় করতে, পড়াশোনা করাতে তিনি কত কষ্টই না করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁর সেই সন্তান তাঁর সাথে এভাবে কথা বলতে পারে। এটাই ছিল নিঃস্ব বৃদ্ধার ধৈর্যের শেষ সীমা। নিজের কয়েকটা কাপড় একটা ব্যাগে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অশ্রুসিক্ত চোখে তিনি বাড়িটির দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন বাবা। আল্লাহর কসম! আমি তোমার ও তোমার স্ত্রীর সাথে সবসময় ভালো আচরণ করেছি। তোমার স্ত্রীকে কখনো কোনো কষ্টও দিইনি। আমার সন্তান, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন।”

এরপর অনেক মাস কেটে যায়। বৃদ্ধা মা পথে পথে ঘুরেছেন। বিভিন্ন জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজেছেন। প্রায়ই তিনি লোকদের কাছ থেকে সন্তানের খবরাখবর নিতেন। ওদিকে বছর গড়িয়ে যেতে না যেতেই ছেলে আর ছেলের বউ দুঃখিনী মায়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

তারপর একদিন ছেলেটি রোগাক্রান্ত হয়। প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল সাধারণ কোনো রোগ; কিন্তু যতই দিন গেল রোগীর অবস্থা গুরুতর হতে থাকল। এই রোগের চিকিৎসা করা কঠিন। ক্লিনিকের ডাক্তার চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে তাকে বড় হাসপাতালে পাঠাল। ছেলের এই অবস্থার কথা শুনতে পেয়ে মা তাকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন। তখনই হাসপাতালে ছুটে গেলেন।

সন্তান যেমনই হোক না কেন, মায়ের মনে সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা থাকবেই; কিন্তু হাসপাতাল থেকে দেখা করার অনুমতি পেলেন না তিনি। আসলে ছেলের বউই হাসপাতালের লোকদের দিয়ে কাজটি করিয়েছে। অসুস্থ ছেলেকে এই অবস্থাতেও একনজর দেখতে না পেয়ে তিনি একবুক কষ্ট নিয়ে ফিরে যান।

দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা হয়। তারপর হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়। অনেকদিন ঘরেও চিকিৎসা চলে; কিন্তু সে আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে না। একসময় জমানো সব টাকা শেষ হয়ে যায়। চিকিৎসার ব্যয়ভার পরিশোধ করতে গিয়ে গৃহস্থালি জিনিসপত্রও বিক্রি করতে বাধ্য হয় তারা। স্ত্রী অসুস্থ স্বামীর দেখাশোনা করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়ে। সবসময় সে স্বামীর উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। রাগ আর করুণার সুরে তার সাথে কথা বলত। স্বামীর সেবা করা যেন তার দায়িত্ব নয়, দয়া। সুযোগ পেলেই তাকে সে গালমন্দ করত; কিন্তু স্বামী ছিল অসহায়। বিছানায় শুয়ে দুর্ব্যবহার সহ্য করা ছাড়া তার কিছুই করার ছিল না।

একদিন স্ত্রী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, “তুমি আমার জীবনে আসার পর থেকে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। আগে তোমার মা আমাকে যন্ত্রণা দিত, এখন তুমি দিচ্ছ। আমার পক্ষে এভাবে থাকা অসম্ভব। আমি এখনই তালাক চাই।”

কথাগুলো শুনে স্বামীর মনে হলো—যেন স্ত্রী তার গালে কষে চড় বসিয়ে দিল; কিন্তু তার কিছুই করার নেই। এরপর তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়।

দিন দিন তার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটতে থাকে। এখন সে সবসময় মায়ের কথা চিন্তা করে। সে বুঝতে পারে যে দেখাশোনা করার জন্য ও সুস্থ হওয়ার জন্য মাকে তার খুব প্রয়োজন; কিন্তু সে জানে না তিনি কোথায় আছেন। লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে; কিন্তু কোথাও কোনো হদিস মেলে না। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সে মায়ের খোঁজে পথে বের হতো। একদিন মাগরিবের সময় একটি মাসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সালাতের জন্য মাসজিদের ভেতরে ঢুকল সে। মাসজিদের দরজায় এক বৃদ্ধা একটি পাত্র হাতে ভিক্ষা চাচ্ছে। বৃদ্ধাকে দেখেই সে অবাক হয়ে গেল। এ যে তাঁর জন্মদাত্রী মা!

মায়ের এই করুণ অবস্থা দেখে সন্তান কষ্টে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে সে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করল। নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য মাফ চাইল দুঃখিনী মায়ের কাছে। এতদিন পর সন্তানকে দেখে মা-ও চোখের পানি আটকে রাখতে পারলেন না। বৃদ্ধা মায়ের হাত ধরে সে বাড়ির দিকে রওনা করল। সে বারবার বলছিল, “যে স্ত্রী আমার মায়ের কাছ থেকে আমাকে আলাদা করেছে, তার ওপর আল্লাহর লানত। আমার পিএইচডি ডিগ্রি অভিশপ্ত। এই ডিগ্রিই আমার অন্তর থেকে দরদী মায়ের ভালোবাসাকে মুছে দিয়েছে। যে বাড়ি আমাকে আমার মায়ের নিকট থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই বাড়ি অভিশপ্ত। আমার ভালো বেতন অভিশপ্ত। এগুলোই আমার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই আমার স্নেহময়ী মায়ের মর্যাদাকে আমি বুঝতে পারিনি।”

বাড়িতে আসার পর ছেলেটি ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদল। সে মায়ের পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। মা তো মা-ই। তিনি ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, “বাবা আমার, তোমাকে কাছে পেয়ে আমার সকল ক্ষোভ, কষ্ট নিমিষেই উবে গেছে। তাছাড়া সন্তানের প্রতি পৃথিবীর কোনো মা-ই তার অভিযোগ দীর্ঘকাল জমা রাখতে পারে না বাবা। আমিও পারিনি।”১ [[১] কিসাসা ওয়া মাস মিন আকুকূল-ওয়ালিদাইন, পৃষ্ঠা ৬৮-৭৪]

আনুগত্যের গল্প : সঠিক পথের দিশা

তেলসমৃদ্ধ ছোট্ট দেশ কুয়েত। যুদ্ধে জয়লাভ করে এই দেশটির দখল নেয় ইরাক। ইরাকি সৈন্য কর্তৃক দেশটি দখল নেওয়ার পর, সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য পরিবার সৌদি আরবে পালিয়ে যায়। সৌদি আরবও তাদের সাদরে গ্রহণ করে নেয়। সে সময় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারও রিয়াদের পথে যাত্রা করে। রিয়াদে পৌঁছার জন্য তখন একটি বিশাল মরুভূমি পার হতে হতো। তাই তারা বড় একটা গাড়ি এবং প্রচুর খাবার-দাবার সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করে; কিন্তু কুয়েত শহর থেকে বের হয়ে তারা পথিমধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ক্রসিং তাদের চোখে পড়ে। সেখানে এক ইরাকি সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত ছিল। গাড়ি থামিয়ে তারা সৈন্যটির কাছে রিয়াদে যাওয়ার রাস্তা জানতে চাইল। সৈন্যটি হাতের ইশারায় রাস্তাটি দেখিয়ে দিল।

পরিবারটি সৈন্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার দেখানো পথে চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর খাওয়া-দাওয়ার জন্য তারা গাড়ি থামাল। বৃদ্ধা মা বললেন, “যে সৈন্যটি আমাদের পথ দেখাল, তার জন্যও তো কিছু খাবার পাঠানো উচিত।”

মা ছেলেটিকে নির্দেশ করলেন, পেছনে ফিরে গিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসতে। মরুভূমিতে অপ্রয়োজনীয় চলাচল অনেক সময় বিপদ ডেকে

আনে। তা সত্ত্বেও বাধ্যগত ছেলেটিও মায়ের কথামতো গাড়ি ঘুরিয়ে সেই সৈন্যের কাছে ফিরে গেল। মায়ের দেওয়া খাবারটুকু তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "জনাব, মা আপনার জন্য কিছু খাবার পাঠিয়েছেন। এগুলো আপনার হাতে পৌঁছে দিতেই আবার ফিরে এলাম।"

সাধারণত মরুভূমিতে খাবার খুব একটা সহজলভ্য নয়। তাছাড়া সৈন্যটি তখন খুব ক্ষুধার্তও ছিল। তাই এই খাবার পেয়ে মনে মনে সে খুব উচ্ছ্বসিত হলো। পাশাপাশি তার মধ্যে তীব্র লজ্জাবোধও কাজ করছিল। এটা এজন্য নয় যে সে অপরিচিত কারও কাছ থেকে খাবার গ্রহণ করছে; বরং তার মধ্যে লজ্জা এবং অপরাধবোধ এজন্যই কাজ করছে যে এই পরিবারটিকে ঠিক কিছুক্ষণ আগেই সে যে রাস্তা দেখিয়েছিল, সেটা মূলত একটা ভুল পথ ছিল। খানাখন্দে ভর্তি। সহজেই গোলকধাঁধাঁয় হারিয়ে যাওয়ার মতো। এই পথে চলতে গিয়ে খাওয়ার পানি বা গাড়ির পেট্রোল শেষ হয়ে এলে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়াও অস্বাভাবিক নয়।

সৈন্যটি দুঃখ প্রকাশ করে ছেলেটির নিকট সব কিছু খুলে বলল। তাদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে রিয়াদে যাওয়ার সঠিক পথটি দেখিয়ে দিল।

মায়ের অভিশাপ

যে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করবে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। আর যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে রাগান্বিত করবে, সে কেবল আল্লাহর ক্রোধই অর্জন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'তার নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক' (একথা তিনি তিনবার বললেন)। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন সে ব্যক্তি, হে আল্লাহর রাসূল?' তিনি বললেন, 'ওই ব্যক্তি যে বৃদ্ধ বয়সে তার পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে পেল, তারপরও (তাদের সেবা-যত্নের মাধ্যমে) জান্নাত লাভ করতে পারল না।'১ [[১] সহীহ মুসলিম : ২৫৫১]

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ যেমন কবুল হয়, তেমন অভিশাপও। তাই কোনো অবস্থাতেই বাবা-মাকে রাগান্বিত করা উচিত নয়।

'আবদুর রাউফ হানাওয়ী ছিলেন একজন বিখ্যাত আলিম। তিনি তাঁর রচিত *বিররুল ওয়ালিদাইন* বইটিতে একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

আমার এক নিকটাত্মীয় ছিলেন স্বনামধন্য একজন ব্যবসায়ী। তার পিতা মারা যাওয়ার সময় অঢেল ধন-সম্পদ রেখে যান। বাবার মৃত্যুর পর মা তার সাথেই থাকতেন। একদিন কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে মা ছেলেকে অভিশাপ দিয়ে বসেন। এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ছেলেটির উপর দুর্ভোগ নেমে আসে। বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোনো

কাজ না করেও সেগুলো দিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারত; কিন্তু মায়ের বদদুআর কারণে চোখের সামনে তার সব সম্পদ হারিয়ে যেতে লাগল। একটা সময় তাকে ভিক্ষা পর্যন্ত করতে হয়। মৃত্যুর সময় এমন অবস্থা হয় যে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অথচ ছেলেটি কখনো দুশ্চরিত্র বা বিলাসী ছিল না। এমনকি জুয়া খেলেও সে সম্পদ নষ্ট করেনি।

বর্ণনাকারী আবদুর রাউফ হানাওয়ী লিখেছেন: আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মায়ের অভিশাপের কিছুদিনের মধ্যেই কীভাবে সন্তানের সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বে বাবার সম্পত্তির কানাকড়িও তার কাছে ছিল না। তার দুর্দশা দেখে আমার বাবা (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) তাকে দান-সাদাকা করতেন এবং তার পরিবারের জন্য খাবার-দাবার পাঠাতেন।১ [[১] সহীহ মুসলিম, আল-বির ওয়াস-সিলাহ, হাদীস : ২৫৫১। আবদুর রাউফ হানাওয়ীর বিররুল ওয়ালিদাইন থেকে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা-১৩৫]

এক বৃদ্ধার ইসলামগ্রহণ

কয়েক বছর আগে এক বিখ্যাত দাঈ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ইউরোপে যান। একদিন তিনি স্টেশনে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর পাশেই বসে ছিলেন একজন বৃদ্ধা।

বৃদ্ধার বয়স সত্তরের বেশি হবে। প্রায় সবগুলো দাঁত পড়ে গেছে। তিনি একটি আপেল খাওয়ার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু অল্প কয়েকটি দাঁত দিয়ে একটা আস্ত আপেল খাওয়া তাঁর জন্য মোটেও সহজ ছিল না।

দাঈ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "মা, আপনি কিছু মনে না করলে আমি আপেলটি কেটে দিই?"

তারপর ব্যাগ থেকে একটি ছোট ছুরি বের করে আপেলটি পাতলা করে কেটে দিলেন তিনি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধাটি অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "মা, আপনি কাঁদছেন কেন?"

কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধা বললেন, "বিগত দশ বছর থেকে আমি একাকী, অসহায়। কেউ আমার খোঁজখবর নেয় না। এমনকি আমার সন্তানও না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য দেশ থেকে এসেছ। তোমার মতো অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে এমন ভালো আচরণ পেয়ে আমার ভেতরটা কেঁদে উঠল।"

মনোযোগ দিয়ে বৃদ্ধার কথা শুনে তিনি বললেন, "মা, আমার ঈমানের তাগিদেই আমি এমন আচরণ করেছি। বাবা-মা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে সদয় আচরণ করতে আমি বাধ্য। এমনকি পিতা-মাতা যদি কর্কশভাবে কথা বলেন তবুও আমি তাঁদের আনুগত্য করতে বাধ্য। পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি। একারণেই আমাদের দেশের সন্তানরা সাধারণত বাবা-মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করে। তাদের ভালোবাসায়। শরীয়াহ (ইসলামী আইন) আমাদের এমন আচরণ করারই নির্দেশ দেয়। আমার মা-ও আপনার মতোই। মা আমার সাথে থাকেন। তিনি এমনভাবে থাকেন যেন তিনিই বাড়ির মালিক। বাড়ির রানি। বাইরে যাওয়ার আগে আমরা তাঁর অনুমতি নিই। তিনি না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে বসি না। আমি নিজে মায়ের সেবা করি। আমার স্ত্রী-সন্তানেরাও এ কাজে আমাকে সাহায্য করে। আমি মায়ের সর্বাত্মক সেবাযত্ন করি কারণ আমাদের ধর্মে এমন নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।"

বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, "তোমার ধর্ম কী?"

তিনি বললেন, "ইসলাম।"

বৃদ্ধা আগেও ইসলাম সম্পর্কে শুনেছেন। তবে খুব বেশি কিছু জানেন না। লোকটির কথা ও কার্যকলাপে বৃদ্ধা অভিভূত হয়ে তখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

এমন দাঈর সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি কাউকে সঠিক পথ (ইসলাম) দেখান, তবে তোমার জন্য তা লাল উটের চেয়েও ভালো।' (সে সময় আরবে লাল উট খুবই দুর্লভ ও মূল্যবান ছিল)।১ [[১] সহীহ বুখারী, আল-জিহাদ-ওয়াস সিয়ার, হাদীস : ৩০০৯; সহীহ মুসলিম, ফাযাইলুস-সাহাবা, হাদীস : ২৪০৬; মুসনাদ আহমাদ : ৫/৩৩৩]

শোচনীয় পরিণতি

রিয়াদ শহরের উপকণ্ঠের সেই হাসপাতালটির অধিকাংশ রোগীই সড়ক দুর্ঘটনার। সেখানকার সাতাশ বছর বয়সী এক প্যারালাইজড রোগী একদিন বিশিষ্ট দাঈ আবদুল্লাহ আল মাতরূদকে এই গল্পটি বলেছিলেন:

আপনি আমাকে বিছানায় পড়ে থাকা অবস্থায় দেখছেন। এখন আমি অথর্ব-অক্ষম একটা মানুষ। বহু বছর আগে আমি একবার দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। তখন থেকেই এই অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছি আমি। আপনাকে আমার গল্পটা বলি—

একদিন আমার মা আমার এক নিকটাত্মীয়কে দেখতে যেতে চাইলেন। তিনি অনুরোধ করলেন আমি যেন তাঁকে সেখানে নিয়ে যাই; কিন্তু আমি সাফ জানিয়ে দিই—হাতে মোটেও সময় নেই। অন্য কোনো দিন নিয়ে যাব।

কিন্তু মা বললেন, "বাবা, তারা একসময় আমাদের অনেক উপকার করেছিলেন, তাদের সে ঋণ শোধ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আজ আমি তাদের সাথে একবার দেখা করতে চাই। একটু কষ্ট করে আমাকে নিয়ে চলো।"

তখন মাকে একটা শর্ত দিয়ে বললাম, "তুমি আধঘণ্টা সময় পাবে দেখা করার জন্য। এই আধঘণ্টা শেষে আমি গাড়ির হর্ন বাজালে তোমাকে সাথে সাথে বাইরে আসতে হবে। যদি না আসো, তাহলে আমি কিন্তু এক মিনিটও

অপেক্ষা করব না। তোমাকে রেখেই চলে যাব। পরেও তোমাকে আর আনতে যাব না।” সেদিন আমার জুড়ে দেওয়া শর্তে মা রাজি হয়েছিলেন।

মাকে পৌঁছে দেওয়ার আধঘণ্টা পর তাঁকে আনতে গেলাম। বাইরে থেকে হর্ন বাজালাম। তিনি বের হয়ে না আসায় আমি গাড়ি নিয়ে দ্রুত ফিরছিলাম; কিন্তু বেশি দূর আসা হয়নি আমার। মারাত্মক এক সড়ক দুর্ঘটনা আমার জীবনটা তছনছ করে দেয়। এখন আমি এভাবেই বেঁচে আছি—পঙ্গু অবস্থায়। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। নড়াচড়াও করতে পারি না। এমনকি পাশ ফিরতেও পারি না। শুধু পিঠ বা বুকের উপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকতে হয় আমাকে। আমি মায়ের সাথে অন্যায় আচরণ করেছি—সম্ভবত একারণেই আমাকে আজ এ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

ফযল বিন ইয়াহ্ইয়া

ফযল বিন ইয়াহ্ইয়া ছিলেন একজন বিশিষ্ট সালাফ। তাঁর সম্পর্কে একবার খলীফা মামুন বলেছিলেন, তার চেয়ে অনুগত সন্তান খুঁজে পাওয়া কঠিন। পিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসার একটি ছোট্ট ঘটনা :

ফযল বিন ইয়াহ্ইয়ার বাবা শীতে গরম পানি দিয়ে ওযূ করতেন। তাই সারা শীতেই তাকে গরম পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো।

একবার কোনো কারণে বাবা ও ছেলে দুজনকেই জেলে নেওয়া হয়। তখন ছিল তীব্র শীত। কয়েদীদের জন্য গরম পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

বাবার জন্য ফযল বিন ইয়াহ্ইয়া গরম পানি চেয়েছিলেন; কিন্তু কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক সাফ না করে দেয়। তখন তিনি তাদেরকে অন্তত কিছু কাঠের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন এবং বিনিময়ে তিনি টাকাও দিতে চেয়েছেন। যেন কাঠ পুড়িয়ে তিনি নিজেই বাবার জন্য পানি গরম করতে পারেন; কিন্তু এবারও তাঁর আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে তত্ত্বাবধায়ক বলে দিল কয়েদীদের জন্য আগুন জ্বালানোর অনুমতি নেই।

এভাবে সব প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে ফযল বিন ইয়াহ্ইয়া নিজেই সারারাত পানির পাত্রটা প্রদীপের কাছে ধরে রাখেন। সকালে ঘুম থেকে উঠলে বাবাকে ওযূর পানি এগিয়ে দেন।

পরদিনও তিনি না ঘুমিয়ে সারারাত প্রদীপের কাছে পাত্র ধরে পানি গরম করলেন; কিন্তু জেল-তত্ত্বাবধায়ক বিষয়টি দেখে ফেলে। পরের রাতে ফযল

বিন ইয়াহ্ইয়া পানি গরম করতে গিয়ে দেখেন যে প্রদীপটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তখন তিনি চিন্তায় পড়ে যান কীভাবে বাবার জন্য পানি গরম করবেন? অনেক চিন্তার পর তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। কনকনে শীতে সেই ঠান্ডা পানিকে তিনি সারারাত পেটে চেপে ধরে রাখলেন যেন শরীরের উষ্ণতায় পানি গরম হয়। পানি আগের মতো গরম হলো না, কিন্তু খুব বেশি ঠান্ডাও ছিল না। বাবা সকালে ঘুম থেকে উঠলে তাকে সেই উষ্ণ পানি এগিয়ে দেন তিনি।

১৯৩ হিজরীতে ফযল বিন ইয়াহ্ইয়া কারাগারেই মারা যান। ইবনুল আসীর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন— ফযল বিন ইয়াহ্ইয়া ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত একজন আদর্শ মানুষ। সারা বিশ্বে তাঁর কোনো জুড়ি নেই।১ [[১] ফযল বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খালিদ বিন বারমাকি সম্পর্কে আরও জানতে : আল-আলাম আল্লামা জিরকিলির (৫/১৫৩); ইবনু-আসীর (৬/৬৯); ওয়াফিয়াতুল-আয়ান (১/৪০৮); তারিখ বাগদাদ (১২/৩৩৪) বইগুলো দেখুন।]

ইবনু তাইমিয়া-এর চিঠি

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ একবার তাঁর মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন :

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, আপনার দুচোখকে প্রশান্তি দান করুন এবং আপনার উপর রাহমাত ও শান্তি বর্ষণ করুন। তিনি আমাদের তাঁর সর্বোত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আমরা আল্লাহ তাআলার অগণিত নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রশংসা করি। তিনি ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই। তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমরা প্রার্থনা করি—তিনি যেন সর্বশেষ নবী ও মুত্তাকীদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল এবং প্রতিনিয়ত আমরা তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হচ্ছি। তাঁর অনুগ্রহের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমরা দুআ করি যেন তিনি আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহকে বাড়িয়ে দেন।

মা, আপনি জানেন যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য আমাকে মিশরে থাকতে হচ্ছে। এই কাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করা না হলে দ্বীন ইসলামের বিকৃতি ঘটার মতো অকল্যাণ ঘটতে পারে।

আল্লাহর শপথ মা, আমি ইচ্ছে করে আপনার কাছ থেকে দূরে থাকছি না। আকাশে পাখিগুলোর যদি আমাকে বহন করার ক্ষমতা থাকত, তবে আমি আপনার কাছে চলে আসতাম; কিন্তু মা, আমি যে কেন আসতে পারছি না তা কেবল আমিই জানি।

মা, আমি এখানে ভালো আছি। এখানে আসার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমনভাবে আমার জন্য তাঁর কল্যাণ, নিয়ামত, দয়াকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং এমনভাবে দিকনির্দেশনা দান করছেন যা আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। এখনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা বাকি আছে। এগুলোকে অবহেলা করলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আমাদের কাজের গুরুত্ব বর্ণনাতীত।

মা, আপনার কাছে একটা অনুরোধ, দয়া করে আল্লাহর কাছে দুআ করার সময় আমাকেও আপনি মনে রাখবেন। সবশেষে অনুগ্রহ করে বাড়ির ছোটবড় সবার কাছে এবং সব বন্ধুর কাছেও আমার সালাম পৌঁছে দেবেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীদের প্রতি অশেষ কল্যাণ ও শান্তি বর্ষণ করেন!

ধনী লোকের মানহানি

চার বছর আগে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে গ্রামে গিয়েছিলাম। প্রায় পঁচিশ বছর পর আমার স্কুল-বন্ধু সাদেকের সঙ্গে দেখা। সে পাশের গ্রামেই থাকে। আমার চেয়ে দুবছরের ছোট। এখনো আমার মনে আছে ছোটবেলায় লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলা ও ঘোরাফেরাতেই সে বেশি সময় নষ্ট করত। বারবার পরীক্ষায় ফেল করত। অষ্টম শ্রেণিতে থাকতে সে স্কুল থেকে পালিয়ে গিয়ে সৈনিক হিসেবে আর্মিতে যোগ দেয়। আমার কাছে ওকে কিছুটা অদ্ভুত মনে হতো। আমি ভাবতাম আর্মিতেই ওকে ভালো মানাবে। আমি জানি না—এতগুলো বছরে তার জীবনে কী ঘটেছে। মানুষের মুখে শুনেছিলাম আর্মির চাকরি ছেড়ে সে নাকি কুয়েত গেছে।

আসলে স্কুলে সে আমার তেমন ভালো বন্ধু ছিল না; কিন্তু এত বছর পর তাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। ছোটবেলার সহপাঠী সে, একসাথে একই বেঞ্চে বসে ক্লাস করেছি; কিন্তু দেখা হওয়ার পর তার মধ্যে কেমন যেন একটা অহংকারের ছাপ লক্ষ করলাম। বিদেশে গিয়ে অনেক টাকা-পয়সা হয়েছে বলে হয়তো তার মধ্যে এই ভাবটা এসেছে। সে জানাল কুয়েত গিয়ে অনেক টাকা আয় করেছে। তার বড় ছেলেকেও কুয়েত নিয়ে গেছে। তিন বার হজ করেছে। গ্রামে একটা বিশাল বাড়ি তৈরি করেছে; কিন্তু ছেলে-মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই তার মন খারাপ হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে যেন তার সব দর্প চূর্ণ হয়ে গেল। চেহারাটা দুঃখ ও হতাশায় ছেয়ে গেল। সবদিক থেকে সে বড়ই অভাগা।

আমি জানতে চাইলাম, “কী হয়েছে?”

এরপর সে নিজেই বলতে শুরু করল, “এগারো লাখ টাকা খরচ করে খুব ধুমধাম করে দুবছর আগে বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছি। শুধু আতশবাজিতেই খরচ করেছি পঞ্চাশ হাজার।”

বিয়ের পরদিন সবাই বৌ-ভাতে এলো। বউয়ের মা-বাবাও এসেছিল। সন্ধ্যায় ছেলে ও বউকে তারা তাদের বাড়ি নিয়ে গেল; কিন্তু তার পরের দিন বউ সাফ জানিয়ে দিল সে আর শ্বশুরবাড়ি আসবে না। কারণ তার স্বামী নাকি একেবারেই অক্ষম। এতটুকু বলতে গিয়ে সাদেকের চোখে পানি এসে গেল।

সে আবার বলতে লাগল, “বউয়ের সেই কথা কামানের গোলার মতো আমার বুকে এসে বিঁধল। মনে হলো আমার সবকিছু মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে। আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। মানুষকে বিলানোর জন্য যত মিষ্টি কিনেছিলাম সব নর্দমায় ছুঁড়ে ফেললাম। আমি আর আমার ছেলে লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারলাম না। অপমানের পরও আমি চেষ্টা করেছিলাম পুত্রবধূকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে; কিন্তু সে স্পষ্টভাবে না করে দেয়। সে আমার ছেলের স্ত্রী। আমার মনে হচ্ছিল সে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করার চিন্তা করে থাকে তবে তা হবে আমার মৃত্যু-সমতুল্য।”

তারপর সাদেক বলল, “ভাই, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার ছেলে কোনোভাবেই অক্ষম ছিল না; বরং ওই মেয়েটার চরিত্রই ভালো ছিল না। সে ছিল ভীষণ চালাক-চতুর। পুলিশে কাজ করছে কিছুদিন। মেয়ের বাবাকেও লোকেরা খুব একটা ভালো জানত না। অন্যদিকে আমার ছেলে

কতই না সহজ-সরল। আসলে ওরা চেয়েছিল যে কোনো উপায়ে মোহরের ৫০০ গ্রাম সোনা আদায় করে নিতে। একপর্যায়ে মেয়ের বাবা মেয়েকে ফুসলিয়ে তালাকের আবেদনও করায়। অবশ্য আমিও ওদের ছেড়ে দিইনি। মামলা দায়ের করেছি। মানুষের কাছে তাদেরও অপমান করেছি। মামলা আঠারো মাস ঝুলে ছিল। অবশেষে তারা স্বর্ণ ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। তারা সমাজে আমার মানহানি করেছে। আমাকে লজ্জিত করেছে। তাই আমিও তালাকের মতামত দিয়ে দিই। আসলে ভাই আমার ভাগ্যটাই খারাপ”—সাদেকের দুঃখভরা অভিব্যক্তি।

সে আবার বলতে লাগল, “এই ঘটনার পর আমার মেয়েকে তোমাদের গ্রামের আকবরের ছেলের সাথে বিয়ে দিই। সোফা, খাট, ডাইনিং-সেট, ফ্রিজ, টিভি থেকে শুরু করে স্টিল, প্লাস্টিক, কাচের গৃহস্থালি টুকিটাকি আসবাবপত্র সবকিছু যৌতুক দিয়েছি। মেয়ের শাশুড়িকে সোনার গহনা দিয়েছি। বরের বাড়ির প্রত্যেককে দামি জামাকাপড় দিয়েছি। বিয়েতে সবাইকে এত আপ্যায়ন করিয়েছি যে গ্রামের সবাই এটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। জামাতাকে কুয়েত নিয়ে গিয়ে সেখানে ভালো চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছি; কিন্তু ওই যে আমার পোড়া কপাল! আমার জামাতা একটা অকৃতজ্ঞ ছোটলোক। প্রথমদিকে ছোটখাট বিষয় নিয়ে সে আমার মেয়ের সাথে ঝগড়া করত। আমি ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করলে সে আমার সাথেও খারাপ ব্যবহার করত। এমনকি আমার চুঁটি পর্যন্ত চেপে ধরত। একদিন শয়তানটা আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে বসে।”

সাদেক করুণভাবে বলল, “ভাই, আমার ভাগ্যটা এত খারাপ কেন? জীবন এতটা নিষ্ঠুর কেন? আমি তিন তিন বার হজ করেছি। তারপরও আমি কেন এত কষ্ট ভোগ করছি?” কথাগুলো বলতে বলতে সে খুব কাতর হয়ে পড়ল। আমি তার হাত ধরে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সাহস রাখতে বললাম এবং ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলাম। এরপর আমি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য বললাম, “ভাই, তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?”

প্রশ্নটা করতেই তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। চোখে পানি চলে এলো; কিন্তু চোখ মুছে মেজাজ খারাপ করে বলল, “মা-বাপ মাটির নিচে। তারা আমার জন্য কিছুই করেনি কোনোদিন; শুধু অভিশাপই দিয়েছে। তাদের অভিশাপের জন্যই আজ আমার এত দুর্দশা।” বাবা-মায়ের সম্পর্কে সাদেকের মুখে এধরনের কথা শুনে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

সে বলল, “এভাবে কথা বলায় তুমি অবাক হচ্ছ, তাই না? সত্যি বলছি তারা আমার জন্য কিছুই করেনি। তোমার বাবা-মায়ের মতো তারা আমাকে কোনো সুশিক্ষা দেয়নি। তোমার বাবা-মা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। ফলে তুমি উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পেরেছ। আর আমি নিজেই নিজেকে গড়েছি। আমি আর্মিতে কাজ করেছি। তারপর কুয়েতে গিয়ে অনেক টাকা আয় করেছি। গ্রামে বাড়ি বানিয়েছি। তারপরও বাবা-মা আমার উপর খুশি ছিলেন না। আমার স্ত্রীর সাথেও তারা ঝগড়া করতেন।”

সাদেকের এরকম কথায় আমি সত্যি হতাশ হলাম। তার কথা আর শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না আমার। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরে লোকমুখে জানতে

পারি যে সাদেক মা-বাবার সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করত। সে ধনী ছিল বটে, কিন্তু মা-বাবার জন্য একটা পয়সাও খরচ করত না। তার স্ত্রী ছিল খুব ঝগড়াটে। শ্বশুর-শাশুড়ির জীবনকে সে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। একসময় সাদেক আলাদা বাড়ি তৈরি করে স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে থাকা শুরু করে। অথচ তার বৃদ্ধ বাবা-মা সেই পুরাতন মাটির ঘরে থেকে যান। এক তপ্ত গ্রীষ্মের বিকেলে বৃদ্ধা চুলায় রুটি সেঁকছিলেন। তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে সেখানেই পড়ে মরে থাকেন। সাদেক তখন কুয়েত ছিল। সে মায়ের জানাযায় আসারও প্রয়োজন বোধ করেনি। এর অল্প কিছুদিন পর তার বাবাও মারা যান। সাদেক তার জানাযায়ও আসেনি।

এক মহিলার মুখে শুনলাম সাদেক হজ করে দেশে ফিরলে মা তার সাথে দেখা করতে যান। তখন সাদেক তাঁকে একটি জায়নামায দেয়; কিন্তু সাদেকের স্ত্রী তার মায়ের হাত থেকে জায়নামাযটি ছোঁ মেরে নিয়ে বলে ওঠে— “তোমার মাকে আমি জায়নামায দেব না।” স্ত্রীর এমন আচরণে সাদেক সেদিন কোনো প্রতিবাদই করেনি। আর ওদিকে তার মা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে যান।

আল্লাহ কেন তাকে শাস্তি দিচ্ছেন তা বুঝতে আমার আর বাকি থাকল না। সেখানেই তার শাস্তি শেষ হয়নি। দুবছর আগে সে তার ওই বড় ছেলেকে আবার বিয়ে দেওয়ার জন্য কুয়েত থেকে দেশে আনায়; কিন্তু এই বিয়েটিও বেশি সুবিধার হয়নি। ছেলে নববধূকে বাড়িতে রেখে কুয়েতে চলে যায়। এদিকে বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। সাদেকের সাথে তার স্ত্রীর অনেক

ঝামেলা হয়। অবস্থা এমন হয় যে সাদেক প্রায় প্রতিদিনই স্ত্রীকে পিটাত। এমনকি পিটানোর জন্য রাস্তায় স্ত্রীর পিছে ধাওয়াও করত। তার স্ত্রী যেমন শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে খারাপ আচরণ করেছে, সে নিজে তার প্রতিফল পাচ্ছে। প্রায়ই তাকে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় দৌড়াতে দেখা যায়।

সবার সামনে সাদেক আর তার ছেলের বউকে সেই মহিলা গালমন্দ করে। ছেলের বউয়ের কারণেই সবসময় সে স্বামীর মার খেয়ে যাচ্ছে। ওদিকে সাদেক চিৎকার করে মানুষকে বলে— "ভাইসব, আমার স্ত্রী পাগল, তাই পিটাচ্ছি। ওর পাগলামি না যাওয়া পর্যন্ত আপনারাও ওকে পেটান।"

সাদেকের জীবনটা একেবারে কুকুরের মতো হয়ে গেছে। সে খুবই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এই ঘটনাটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে তিনি বলেছেন :

'সে ব্যক্তির নাক ধুলিমলীন হোক, সে ব্যক্তির নাক ধুলিমলীন হোক, সে ব্যক্তির নাক ধুলিমলীন হোক।' প্রশ্ন করা হলো— 'হে আল্লাহর রাসূল, কে সেই ব্যক্তি?' তিনি বললেন— 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে যেতে পারল না।'

সেতুবন্ধন

জন্মের আগেই ছেলেটির বাবা তার মাকে ছেড়ে অন্য এক শহরে চলে যান। হয়তো বাবা-মায়ের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে দ্বিমত হয়েছিল। যে কারণেই হোক, বাবা আর মায়ের সাথে থাকতে চাইছিলেন না। আর তাই অনেকটা ইয়াতিমের মতো ছেলেটি এই পৃথিবীর আলো দেখল।

মা তাঁর একক আয় থেকে অনেক কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করতে লাগলেন। ছেলেটি কোনোদিন তার বাবাকে দেখেনি। যখন সে বুঝতে শিখল, তখন বাবার উপর তার খুব রাগ হতো। সে বুঝতে পারত না যে কেন তার বাবা তাকে দেখতে আসেন না। সে ভাবত মায়ের সাথে হয়তো বাবার বনিবনা হয়নি, তাই বলে কি নিজের ছেলেকেও তিনি দেখতে আসবেন না?

ছেলেটি এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক; কিন্তু এত বছরে সে মাত্র তিনবার তার বাবাকে দেখেছে। স্বভাবতই বাপ-ছেলের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

একদিন ছেলেটির জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব এলো। মেয়েটি ছিল ভদ্র, শান্ত ও ধার্মিক। মা-ছেলে দুজনই তাকে পছন্দ করল। মেয়ের বাবাও ছিলেন একজন সৎ মানুষ। সামান্য একটা আংটি দিয়েই বিয়ে হয়ে গেল মেয়েটির সাথে। নববধূ বাড়িতে এসে তার চমৎকার ব্যবহারে সবার মন জয় করে ফেলল।

কয়েক দিনের মধ্যেই মেয়েটি স্বামীর সাথে শ্বশুরের দূরত্বের ব্যাপারটি বুঝতে পারল। সে ছিল খুব ভালো একটি মেয়ে। কীভাবে বাবার সাথে ছেলের মিল করিয়ে দেওয়া যায়—সেই চেষ্টা করতে লাগল সে। ঘটনাটিকে মেয়েটি এভাবে বর্ণনা করেছে:

বিয়ের পর আমি জানতে পারলাম আমার স্বামীর সাথে তার বাবার কোনো যোগাযোগ নেই। আমার স্বামী তার বাবাকে ঘৃণার চোখে দেখে। এমনকি তার নাম শুনলেও অসম্ভব রেগে যায়। অনেক চিন্তাভাবনা করে তাদের দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার জন্য একটা পরিকল্পনা করলাম।

একদিন আমার স্বামীর কাছে 'সিলাহ রেহমি'র (আত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা) অর্থ জানতে চাইলাম; কিন্তু তার উত্তর শুনে বুঝতে পারলাম—ইসলামের এই চমৎকার বিষয়টি সম্পর্কে তার তেমন কোনো ধারণা নেই। বিশেষ করে বাবার সাথে সদাচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

পিতা-পুত্রের দূরত্ব ও শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যকার দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের কারণে বাড়িটির পরিবেশ সবসময় ভারী হয়ে থাকত। তাই একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কতদিন আমরা আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করব? আমরা নিজেরাই যদি অন্যায্য আচরণ করি, তাহলে কীভাবে আশা করতে পারি যে আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমাদের প্রতি সদাচরণ করবে?'

এভাবে আমার স্বামীকে তার বাবার সাথে দেখা করতে রাজি করানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। তাকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতাম; কিন্তু

কখনোই তাকে অপমানসূচক কোনো কথা বলিনি; বরং ভালোবাসা ও বিনয়ের সাথে একটু একটু করে তাকে বোঝাতে লাগলাম।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার মা জীবিত আছেন?” লোকটি বললেন, “হ্যাঁ।” তিনি বললেন, “তাহলে তাঁর পা আঁকড়ে ধরো। সেখানে জান্নাত।”১ [[১] নাসায়ী, তাবারানী, হাদীসের সনদ হাসান। তবে হাকিম রহ. এবং যাহাবী রহ. সহীহ বলেছেন আর মুনযিরী রহ. স্বীকৃতি দিয়েছেন।]

যে সন্তান তার বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না সে একজন অভিশপ্ত। আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا আয়ে ২৩

“তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত তোমরা করবে না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; তাদের সাথে কথা বলো সম্মানসূচক নম্রভাবে।”১ [[১] সূরা বানী-ইসরাঈল, ১৭ : ২৩]

যতবারই আমি তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে যেতাম, সে আমাকে বলত জন্মের আগেই তার বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। কখনো তিনি

তাকে দেখতে আসেননি। তার কারণেই বাবা থাকতেও তাকে একটা ইয়াতিমের মতো জীবনযাপন করতে হয়েছে। ছোট থেকেই সে কষ্ট পেয়ে পেয়ে বড় হয়েছে। তার বাবা তাকে বঞ্চিত করেছে।

একদিন সে খুব আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল, 'কীভাবে আমি এমন একজনের সাথে সদাচরণ করব, যে জীবনে কখনো আমাকে কোনো সুখ দেয়নি, শুধু কষ্টই দিয়েছে? আমি কোনোদিন বুঝতেও পারিনি বাবা মানে কী? বাবার ভালোবাসা কেমন? কীভাবে বাবাকে ভালোবাসতে হয় তাও আমার জানা নেই।'

আমি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি যে তোমার বাবা তোমার প্রতি তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন; কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার প্রতিও তোমার দায়িত্ব-কর্তব্য ফুরিয়ে গেছে। বাবা হিসেবে তোমার উপর তাঁর একটা অধিকার আছে—এটাই সত্য। তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওই হাদীসটি শোননি? কোনো মুসলিমের অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সময় ধরে কথা বলা থেকে বিরত থাকা কিংবা দেখা হলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। আর তাদের দুজনের মধ্যে সে-ই ভালো যে আগে সালাম দেয়।'২ [[২] আল-আদাব আল-মুফরাদ, আল-বুখারী, হাদীস : ৪০৬; শাইখ আলবানী এই হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন।]

তারপর আমি বললাম, 'তুমি তোমার বাবার সাথে যেমন ব্যবহার করছ, আমার গর্ভের সন্তানও যদি আমাদের সাথে তেমন ব্যবহার করে, তাহলে

কেমন লাগবে তোমার—কখনো কি এ বিষয়টা ভেবে দেখেছ? তুমি কি নিজের ছেলে-মেয়েরাদের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হতে চাও না?'

আল্লাহর অশেষ রাহমতে আমার স্বামী ধীরে ধীরে আমার কথা শুনতে শুরু করল। আমি বুঝতে পারলাম বাবার প্রতি তার অন্তর নরম হতে শুরু করেছে। তখন সেই সুযোগে বাবা-মায়ের অধিকার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা আমি তাকে জানালাম।

তারপর একদিন আমি তাকে বাবার সাথে দেখা করার অনুরোধ করলাম। সে তাতে রাজি হলো। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন: 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।'১ [[১] আল-মুমিন ৪০: ৬০]

আল্লাহর কাছ থেকে আমার প্রার্থনার উত্তর এলো। আমরা দুজনেই গেলাম তার বাবার সাথে দেখা করতে। প্রথমবারের মতো আমার স্বামী তার বাবার কপালে চুমু খেল। কতগুলো বছর পরে পিতা-পুত্র একত্র হয়েছে। এরকম আবেগঘন মুহূর্তে দুজনের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বাবা সন্তানকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখলেন, যেন ভালোবাসার সব ঋণ একবারেই শোধ করে ফেলবেন। বাবা-ছেলের মধ্যকার এই মিলন দেখে খুশিতে আমার অন্তরটা ভরে গেল!

পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে এমন ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হলো যে মনে হতো তাদের কখনোই বিচ্ছেদ হয়নি। নিয়মিত তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। আমার স্বামী বাবার প্রতি খুব অনুগত ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠল। আমার শ্বশুরও সন্তানের অধিকার আদায়ের সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন।

আল্লাহর অশেষ রাহমতে আমার মতো একজন পাপী মানুষ দুটি হৃদয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হলো।২ [[২] কিসাস মুআসারাহ্ ফি বির ওয়া-উকুকুল-ওয়ালিদাইন, পৃষ্ঠা : ২০, ২১]

অশুভ পরিণাম

ছেলেটি মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তানগুলো মা-বাবার চোখের মণি হয়ে থাকে। সারাক্ষণ তারা তাকে চোখে চোখে রাখে। ঠিক একারণেই হয়তোবা মায়ের স্বপ্নের সবটুকু ঘিরে ছিল ছেলেটি। একাকী মা যে কী পরিমাণ কষ্ট করে ছেলেকে দিনের পর দিন লালন-পালন করেছেন, পড়াশোনা করিয়েছেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করবেন—এমন স্বপ্নে বিভোর ছিলেন মা। এমনও দিন গেছে তিনি ছেলের সাথে ক্লাসে যেতেন, আবার জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে প্রতিদিন দিন-মজুরির কাজও করতে হতো।

দিন গড়াতে লাগল। ছেলের সামনে স্কুল-সমাপনী পরীক্ষা। উদ্বিগ্ন মা। অবশেষে খবর পেলেন সন্তান পাস করেছে। ফলাফল খুব ভালো হওয়ায় কলেজে পড়ার সুযোগও পেয়েছে। মায়ের খুশি তখন চোখে-মুখে উপচে পড়ে।

এভাবে ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুল। যেদিন সে গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট মায়ের হাতে তুলে দেয়, মা আনন্দে বাকহারা হয়ে যান। ছেলেকে শিক্ষিত করতে গিয়ে যে কষ্ট তিনি করেছেন তা বৃথা যেতে পারে না। ছেলের পড়াশোনার পাঠ শেষ হতেই মায়ের মনে এলো বিয়ের চিন্তা। উৎফুল্ল কণ্ঠে একদিন ছেলেকে বললেন:

—'বাবা, তোমার মামাকে কথা দিয়েছিলাম তার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দেব। মেয়েটিও তোমাকে পছন্দ করে, তোমার সফলতার জন্য সে সবসময় দুআ করে। আমার ধারণা তোমার বিয়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

—'প্রশ্নই আসে না, এটা তুমি কী বললে মা? আমি কোনো গেঁয়ো, অশিক্ষিত, নিচু বংশের মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না।'

কথাটা একেবারে মায়ের বুকের ভেতরে গিয়ে লাগল। যেন ক্ষত-বিক্ষত করে দিল তাকে। তবুও তিনি ধৈর্য ধরলেন। স্বাভাবিক থাকলেন। ছেলেকে বুঝতেও দিলেন না যে কতটা আঘাত তিনি পেয়েছেন। পছন্দের মেয়েটির সাথে ছেলের বিয়ের সুখকে ঝেড়ে ফেললেন সাথে সাথেই। একদিন কথাটা মেয়েটির কানে গিয়ে পৌঁছল। সেও খুব কষ্ট পেল। ফুপাতো ভাইটিকে সে অনেক উঁচু নজরে দেখত, তার একেকটা সফলতা তার নিজের সফলতা মনে হতো। এ প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যানের রূঢ়তা তার জীবনে একটা বড় আঘাত।

দিন যায়। শহরে ছেলেটির ভালো চাকরি হলো। তার ইচ্ছে সে গ্রামের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে শহরে বাড়ি করবে। মায়ের কাছে সে এ ব্যাপারে একদিন বলে বসল। নিজেদের বহু স্মৃতিবিজড়িত ভিটে ছাড়তে হবে—এটা ভাবতেই মায়ের বুক যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। তবুও মা ভাবলেন, 'সন্তানের চেয়ে তো আর ভিটেবাড়ি বড় নয়।' তিনি ছেলেকে নিজেদের জমিটুকু বিক্রি করার জন্য অনুমতি দিয়ে দিলেন। শহরে বাড়িও মিলে গেল একটি। দলিল লেখকের প্রশ্ন— 'কার নামে রেজিস্ট্রেশন হবে?'

বিস্ফোরিত চোখে জবাব দিল ছেলে— 'আবার কার, আমার নামে।' কথাগুলো বলার আগে মতামত জানতে চাওয়া তো দূরের কথা, মায়ের দিকে ফিরেও তাকাল না সে। ভুলে গেল গ্রামের বাড়িটির মালিক কে ছিল, ভুলে গেল কোন টাকায় তার এ বাড়ি কেনার সাহস হলো।

অফিসে যাওয়া-আসার পথে প্রায়ই ছেলেটির চোখে পড়ে পাশের বাড়ির সুন্দরী মেয়েটিকে। এক রাতে খেতে বসে সে মাকে পছন্দের কথাটা বলেই ফেলল। 'দেখে মনে হয় অভিজাত ঘরের মেয়ে, শিক্ষিত, মার্জিত। ঐতিহ্য ও আধুনিকতা দুই-ই আছে। তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার মত কী?' মা তো মা-ই। তিনি সবসময় সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। কাঙ্ক্ষিত স্মৃতি মনে চেপে রেখে তিনি বললেন, 'তোমাদের দুজনকে খুব ভালো মানাবে।'

—'মা, তুমি কি তাদের বাড়ি গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা দেবে?'

—'দেবো বাবা, আশা করি তারা রাজিও হবে।'

মেয়ের পরিবার প্রস্তাবে সম্মত হলো। ছেলেটা উচ্চ শিক্ষিত, ভালো চাকরিও করে, পছন্দ না হবার কোনো কারণ নেই। কিছুদিন পর বিয়ে হলো। ছেলে যখন মায়ের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করতে অসম্মতি জানায়, তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন; কিন্তু এখন তিনি খুশি। নাতি-নাতনির মুখ দেখার আশায় তিনি দিন গুনতে লাগলেন।

কিছুদিন পর তাদের একটি ছেলে হলো। সারাক্ষণ দাদি নাতিকে কোলে নিয়ে রাখেন, চুমুতে চুমুতে ভরে দেন দু-গাল। দোলনায় দুলিয়ে ঘুম পাড়ান।

নাতি-নাতনিদের জন্য দাদা-দাদির ভালোবাসা অন্য মাত্রার হয়। অনেক দিন ধরে শিশুটিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করতে থাকলেন তিনি।

প্রতিটি সম্পর্কের পেছনে ভালোবাসার সাথে শ্রদ্ধাবোধও থাকতে হয়। ছেলেটির স্ত্রী সুন্দরী হলেও তার আচরণ ভালো ছিল না কখনোই। স্ত্রী আর শাশুড়ির মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হতে লাগল। একদিন সে স্বামীকে বলেই ফেলল, 'তোমার মা আমার জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে দিয়েছে।' এই মন্তব্য স্বামীকে বিচলিত করে তুলল। সে চুপ থাকতে পারল না।

—'তুমি কী বলতে চাও?'

—'হয় বাড়িতে আমি থাকব অথবা তোমার মা থাকবে।'

—'কী বলছ এসব? হাজার হলেও তিনি আমার মা।'

—'ওই বুড়ি তোমার মা, কিন্তু আমার শাশুড়ি। সে কি তোমার কাছে আমার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমি তোমার জীবনসঙ্গিনী। আমাকে বল কাকে তোমার বেশি দরকার?'

স্ত্রীকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছিল হতভাগ্য স্বামী, 'আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। আমি দেখছি কী করা যায়। তুমি একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরো কয়েকদিন।'

ওদিকে দাদি সবসময় নাতির দেখাশোনা করেন, খাইয়ে দেন, গোসল করিয়ে দেন; কিন্তু বউয়ের পর ছেলেও এখন মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করতে শুরু করল। এত রুক্ষ আচরণ, এত তিরস্কার, এত গঞ্জনা সহ্য

করতে পারলেন না। একদিন বৃদ্ধা বেরিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে, এক নিকটাত্মীয়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন। কিছুদিনটা অনেকদিন হয়ে গেল। নাতির কথা খুব মনে পড়ে। আবার তিনি বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, হয়তো ছেলে বউয়ের মন গলেছে এই ভেবে।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুর। কড়া রোদে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত বৃদ্ধা বাড়ির দরজায় দাঁড়ালেন। কড়া নাড়লেন। কেউ দরজা খুলল না। ছোট্ট নাতিটির কথা ভাবতেই তাঁর মনে অজানা একটা আশঙ্কা ভর করল। কড়া নাড়তে থাকলেন না থেমেই, ধাক্কাও দিলেন বারকয়েক। হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ছেলের বউ। চিৎকার করে বলল, ‘ওঃ আপনিই তাহলে দরজা ধাক্কা দিচ্ছিলেন? কেন এসেছেন বলেন তো? কী চান আপনি? আমাদের সুখ সহ্য হচ্ছে না আপনার, তাই না? আমাদের সুখের সংসারে আবার আগুন লাগাতে এসে পড়েছেন।’

—‘বৌমা, তুমি এ কী বলছ? এভাবে কেন কথা বলছ? আমি তো শুধু তোমাদের দেখতে এসেছি।’

—‘কিন্তু আমরা তো আপনাকে দেখতে চাইনি।’

এবার ছেলে বেরিয়ে এলো। সে তার স্ত্রীর সব কথাই শুনেছে। কিছুটা ইতস্তভাবে মাকে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে।

—‘মা, কেন তুমি এখানে এসেছ?’

ছেলের এই প্রশ্ন শুনে মা বিস্ময়ে একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

—'কিছু বলবে?'

—'না, কী বলব? শুধু ভাবছিলাম...'

—'কী ভাবছিলে?'

—'আমি এখন কোথায় যাব?'

স্ত্রীর সাথে মন্ত্রণা করে বেরিয়ে এসে বলল, 'মা চলো তোমাকে একজন আত্মীয়ের কাছে নিয়ে যাই, তার সাথে অনেকদিন দেখা হয় না।' বৃদ্ধা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'চলো।'

মাকে নিয়ে ছেলে রওনা দিল। হাত ধরে নিয়ে গেল একটি সাদামাটি বাড়িতে। বৃদ্ধা বুঝতে পারছিলেন না তিনি কোথায় এসেছেন। কোন আত্মীয়ের বাড়ি এটি? শুধু দেখেছেন তাঁর নামটি একটা খাতায় উঠল। তাকে একটা বিছানা দেওয়া হলো।

বাড়ি ফিরতেই শিশুটির চিৎকার, 'দাদি কোথায়? দাদির কাছে যাব। দাদিকে যেখানে রেখে এসেছ আমাকেও সেখানে রেখে আসো।' দাদি-দাদি বলে কাঁদতে থাকা ছোট শিশুর কান্নাতেও বাবা-মায়ের মন গলল না। অসহায় দাদি একাকী বৃদ্ধাশ্রমে রয়ে গেলেন।

অবশেষে বৃদ্ধার কাছ থেকে রেহাই পেয়েছে ভেবে ছেলের বউ খুবই খুশি—এখন সত্যিই জীবনটাকে উপভোগ করা যাবে। পরিকল্পনা হলো এক বন্ধুর বাড়িতে এ উপলক্ষে তারা বেড়াতে যাবে। বেরিয়েও পড়ল। অনেক দূরের পথ। এমন যাত্রায় গাড়ি চালানো বেশ মজা। গাড়ি দ্রুততম গতিতে সামনের

দিকে ছুটে চলছে। ছেলেটি একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ফেলে আসা মায়ের জন্য মনটা কেমন যেন করছে। মায়ের করুণ মুখটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ভেসে উঠছে অতীতের শত স্মৃতি। মায়ের সহস্র ত্যাগ আর কষ্টের চিত্রগুলো। আচমকা সে তার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল— 'থামাও থামাও'। কিন্তু থামতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। ইতোমধ্যে গাড়িটি চলে গেল চলন্ত ট্রাকের তলায়। ছেলের বউ ঘটনাস্থলেই মারা গেল। ছেলেটি মারাত্মকভাবে আহত হলো। কেবল নিষ্পাপ শিশুটিই অলৌকিকভাবে অক্ষত রয়ে গেল।

ছেলেটির জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে। আত্মগ্লানিতে মা-মা করে চিৎকার করে উঠল। 'মা, তুমি কোথায়? তোমরা দয়া করে কেউ আমার মাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।' ওইদিকে মা কোনোভাবে ছেলের পরিণতির কথা শুনতে পেলেন। শুনে এত কষ্ট পেলেন যে ছেলের দেওয়া সব কষ্ট মুহূর্তেই ভুলে গেলেন তিনি। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। অস্থির হয়ে উপরের দিকে হাত তুলে দুআ করতে থাকলেন, 'হে আল্লাহ, আমার সন্তানকে আপনি সুস্থ করে দিন, ভালো করে দিন।'১ [[১] হাওাদিস ওয়াকিয়াহ, পর্ব ১। সংকলন করেছেন মুহাম্মাদ আবদুল আজিজ আল-হুমাইদি।]

আনুগত্যের গল্প : মৃত্যু থেকে রক্ষা

ঘটনাটি মায়ের এক অনুগত সন্তানের। সে কোনো ব্যাপারে মায়ের আবদার রক্ষা করেনি, এমনটা হয়নি কখনো। মা কোথাও ঘুরতে যেতে চাইলেও ছেলেটি মাকে সঙ্গ দিত। একদিন বন্ধুদের সাথে ছেলেটির বেড়াতে যাওয়ার কথা। তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক বন্ধু গাড়ি নিয়ে ওর বাড়িতেও এলো। অনেক দিন পর বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারটি ভাবতেই তার মধ্যে অদ্ভুত একটা ভালো লাগা কাজ করছে; কিন্তু মায়ের অনুমতি ছাড়া সে কোথাও যায়নি কখনো। এমনকি মায়ের ইচ্ছের উপর নিজের ইচ্ছেকে কখনোই প্রাধান্য দেয়নি সে। তাই সে মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল— 'মা, তোমার কোনো কাজ না থাকলে আমি কি আজ বন্ধুদের সাথে একটু বেড়াতে যেতে পারি?'

মা হাসি-মুখেই বললেন, 'না বাবা, আমার তেমন কোনো কাজ নেই। তুমি চাইলে যেতে পার। তবে একটু সাবধানে থেকো। আল্লাহ তোমাদের হিফাযত করুন।'

ছেলেটি মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে উঠে হঠাৎ মনে পড়ল তার কোনো একটা জিনিস বাসায় রয়ে গেছে। সেটা নেওয়ার জন্য সে আবার বাড়িতে ঢুকল।

তাকে দেখেই মা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। নরম স্বরে বলতে লাগলেন, 'বাবা, তোমার কি আজ যেতেই হবে? কেন জানি তুমি বাসা থেকে বের

হওয়া মাত্রই খুব খারাপ লাগছিল আমার। শরীরটাও কেমন যেন লাগছে। আজ বেড়াতে না গেলে তুমি কি খুব কষ্ট পাবে?'

—'অবশ্যই না মা'—ছেলেটি বলল। 'তোমার শরীর খারাপ রেখে আমি কোথাও গিয়েছি কখনো? বরং তোমাকে এই অবস্থায় রেখে গিয়ে আমার ভালো লাগবে না। আমি প্রয়োজনে অন্য কোনো দিন যাব, ইন শা আল্লাহ।'

এরপর বাইরে গিয়ে তার বন্ধুর নিকট সবকিছু বুঝিয়ে বলে। বন্ধুটিও জানে সে তার মায়ের খুবই বাধ্য সন্তান। 'সমস্যা নেই বন্ধু, তুই বরং আন্টিকে সময় দে'—এই বলে বন্ধুটা গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

এর কিছুক্ষণ পরেই ওই এলাকায় ভীষণ হইচই শুরু হলো। তাদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই একটা মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় যে ছেলেটি নিহত হয়েছে, সে আর কেউ নয় তারই বন্ধু—যার সাথে আজ তার বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল।১ [[১] সা'আদাতু-দারাইন ফি বিররিল-ওয়ালিদাইন, পৃষ্ঠা ৭৬, ৭৭।]

অবাধ্যতা

অবাধ্যতার শেষ সীমা যাকে বলে, ছেলেটা ছিল তাই। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ায় তাদের অত্যধিক ভালোবাসা তাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। বাবা-মাকে কোনো গুরুত্বই দিত না সে। প্রায়ই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত। তাদের অসম্মান বা কষ্ট দেওয়াকে সে কোনো অপরাধই মনে করত না। বড় হওয়ার পরও তার আচরণের কোনো পরিবর্তন ঘটল না। দিন দিন তার দুর্ব্যবহার চরম হতে থাকল।

আপন সন্তানের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত এই ব্যবহার সহ্য করতে করতে একদিন বাবা মারা গেলেন। একাকী মা এখন দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে থাকেন সন্তানের অবাধ্যতা। মায়েরা বোধহয় অন্য প্রজাতির মানুষ হয়ে থাকেন। সন্তান অবাধ্য হলেও তাদের অন্তরে থাকে অপরিসীম ভালোবাসা। তারা অনেক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। সবসময় সন্তানের সাথে ভালো আচরণ করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর মা সন্তানের কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তাও তিনি সবসময় তাকে সদুপদেশ দিতেন। ছেলেটা কোনো কিছুই পাত্তা দিত না। ইসলামের মূল্যবোধকে সে দুই পয়সারও দাম দিত না; বরং তার মা কিছু বললে সে উল্টো আরও বেশি খারাপ ব্যবহার করত। অবস্থা খারাপ হতে হতে তার দুর্ব্যবহার সীমা অতিক্রম করে। করুণাময়ী মা একদিন বলেই ফেলেন, ‘তোমার অভদ্রতা সব সীমা অতিক্রম করেছে। নিজেকে

পরিবর্তন করো। সঠিক পথে ফিরে এসো। এভাবে চলতে থাকলে আমার ভাইয়ের কাছে আমি অভিযোগ দিতে বাধ্য হব। তিনি তোমাকে ভদ্র হতে বাধ্য করবেন।'

সদুপদেশ আর মমতাভরা স্পর্শে যখন কাজ হচ্ছিল না, মা ভেবেছিলেন একটু শাসালে হয়তোবা সে শুধরাবে। একটু সংযত হবে; কিন্তু হায়! তাতেও কোনো লাভ হলো না। উল্টো তার মামাকেও সে যাচ্ছেতাই ভাষায় অপমান করল এবং ক্ষতি করার হুমকি দিল।

ছেলেটির বয়স চব্বিশ। উপচে পড়া তারুণ্যের এ ভরা মৌসুমে মানুষ দৈহিক শক্তির বলে 'ধরাকে সরা জ্ঞান করে'। কেউ ছেলেটির ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে সে তার উপর চড়াও হতো। একদিন মা ছেলেটিকে ছোট্ট একটা উপদেশ দিল। নিজের তারুণ্য, শক্তি আর ঔদ্ধত্যের মোহে অন্ধ হয়ে থাকা ছেলেটি তাতে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। এক পর্যায়ে নিজের পায়ের জুতো খুলে তার মায়ের দিকে ছুঁড়ে মারল। জুতোটা গিয়ে লাগল মায়ের পিঠে। অপমানে বিধ্বস্ত মা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কীভাবে এমন ছেলেকে পেটে ধরেছেন তিনি! গভীর ও প্রচণ্ড শোকে তার মুখ দিয়ে দুঃখ আর অভিশাপ চলে এলো।

মাকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখেই ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তার এই আচরণের জন্য সে বিন্দুমাত্রও লজ্জিত না। প্রতিদিনকার মতো অনেক রাত পর্যন্ত সে তার বখাটে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিল। মদ, সিগারেট আর নেশা করে টলতে টলতে বাসায় ফিরল। একটিবারের জন্যও সে তার মায়ের

খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। বাসায় ফিরেই সোজা নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিল। নেশাখোরদের ক্ষেত্রে যা হয়—শোয়ামাত্রই সে অঘোর ঘুমে তলিয়ে গেল। আর অন্যদিকে দুঃখিনী মা অপমানে তখনো ছটফট ছটফট করছেন। আত্মহত্যা নেহাৎ পাপ বলে, নয়তো এতক্ষণে তিনি নিজেকে এই জঞ্জালময় পৃথিবী থেকে মুক্ত করে নিতেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পরে ছেলেটি ভয়ে-আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল। যে হাত দিয়ে সে মায়ের দিকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে সে হাতটা আর নড়ছে না। কোনোভাবেই যেন সে হাত নাড়াতে পারছে না। মনে হচ্ছে খুব ভারী কিছু তার হাতের উপর উঠে এসেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর ব্যথায় সে কাতর হয়ে পড়ল। অচল হাত ধরে সে কাঁদতে শুরু করল। মমতাময়ী মায়ের জন্য সেটি ছিল নতুন একটা দিন। সকালে উঠে তিনি ঘরের কাজ করেছেন। ছেলের জন্য নাস্তা তৈরি করেছেন। গোসলখানায় ছেলের গোসলের জন্য পানি, সাবান ইত্যাদি রেখে এসেছেন। এমন সময় ছেলের চিৎকার শুনে তিনি ছেলের ঘরে ছুটে এলেন। চরম অত্যাচারী সন্তানের এরকম অবস্থা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। এমন হতভাগা সন্তানের জন্যও মায়ের অন্তরে মায়া থাকে, তাঁর চোখ জুড়ে নামে অশ্রুধারা। সন্তানের অক্ষম হাতের জন্য দুআ করা ছাড়া মায়ের এখন আর কিছুই করার নেই। সন্তানের নির্দয় আচরণের কথা ভুলে গেলেন তিনি, উপরের দিকে হাত তুলে আল্লাহর সাহায্যের জন্য অনুনয়-বিনয় করলেন; কিন্তু ইতোমধ্যেই আল্লাহর হুকুম কার্যকর হয়ে গেছে।১ [[১] আল্লাহর বিচার তো এমনই হয়।]

উপলব্ধির গল্প : অবুঝ শিশুর ভাবনা

এক বিকালে মা তার বড় ছেলেকে স্কুলের পড়া দেখিয়ে দিচ্ছিল। ছোট ছেলেটির তখনো স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি। সে মায়ের পাশে বসে রঙ-পেন্সিল দিয়ে বিভিন্ন ছবি আঁকছে আর একটু পর পর ছবিগুলো মাকে দেখাচ্ছে। রাতের খাবার খাওয়ার সময় হয়ে এলো, তাই মা উঠে গিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল শ্বশুরের খাবার দিতে।

বৃদ্ধ শ্বশুর বাড়ির উঠোনের একপাশে একটি মাটির ঘরে একা থাকেন। ছেলের বউ বৃদ্ধকে বাড়ির ভেতর রাখতে চায় না। বউয়ের দাবি, তিনি উঠোনের কোণে ছোট্ট ঘরটায় বসে বসে সারাদিন ‘ইবাদাত’ করুক। সেটাই ভালো। তবে ছেলের মোটেও ইচ্ছে ছিল না বাবাকে উঠোনের ঘরে পাঠানোর; কিন্তু তার স্ত্রীর পীড়াপীড়িতেই বাবাকে বাড়ির পাশের ওই ছোট্ট ঘরটিতে না পাঠিয়ে উপায়ও ছিল না।

রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে শ্বশুরের ঘরে গিয়ে খাবার দিয়ে এসে আবার দুই ছেলের পড়ার টেবিলে এসে বসল মহিলা। দেখল, ছোট ছেলেটা ইতোমধ্যে পেন্সিল দিয়ে খুব সুন্দর একটি ছবি এঁকেছে। মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, “বাবা, তুমি কী করছ?”

—'আমার জন্য একটা বাড়ি বানাচ্ছি। আমি বড় হয়ে বিয়ে করব। তারপর আমার বউ-বাচ্চাদের নিয়ে আমি এই বাড়িতে থাকব'—শিশুটি বলল।

শিশুর মুখে এরকম বড়দের মতো কথা শুনে মা বিস্মিত হয়ে গেল। এরপর সে দেখল, বাড়ির পাশে ছোট্ট একটি চতুর্ভুজ আঁকা। মা প্রশ্ন করল, 'এটা কী বাবা?'

শিশুটি বলল, 'এটা আমার মামণির ঘর। আমি এটা তোমার জন্য তৈরি করেছি আম্মু। তুমি যখন বুড়ি হবে, তুমি ওই ঘরটাতে থাকবে।'

মা মলিন মুখে বলল, 'তাহলে কি তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দেবে? আমি একা একা থাকব? সবার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে? আমার কষ্ট হবে না?'

শিশুটি বলল, 'না, আমি তোমাকে একা রাখব না তো। দাদার ঘরের মতো তোমাকে একটা ঘর বানিয়ে দেবো। মাঝে মাঝে তোমার সাথে দেখা করতে যাব। আমার বউ তোমাকে খাবার দিয়ে আসবে।'

যদিও শিশুটি অবুঝ মনে এগুলো বলেছে, মহিলা তাতে খুব কষ্ট পেল। সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। তার বোধোদয় হলো যে, শ্বশুরের সাথে তার আচরণ পরিবর্তন করা উচিত। সে মনে মনে বলল, 'আল্লাহর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই ছোট্ট শিশুকে দিয়ে এই কথাগুলো বলিয়ে তিনি আমাকে সতর্ক করেছেন। নিজেকে সংশোধন করার একটি সুযোগ দিয়েছেন। নতুবা আমি কখনোই বুঝতে পারতাম না যে, আমার আচার-আচরণ দেখে সন্তানরা

শিখছে। আমরা তাদের সাথে যেমন করছি, তারাও একসময় আমাদের সাথে তেমনই করবে।'

মহিলাটি তখনই গিয়ে শ্বশুরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে এসে সুন্দর একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। সে প্রতিজ্ঞা করল যে, আজ থেকে সে খুব আন্তরিকতার সাথে শ্বশুরের সেবাযত্ন করবে। তার সাথে কোনো খারাপ আচরণ করবে না। বৃদ্ধ নতুন ঘরে এলো। নতুন ঘরে এসে নাতিদের দেখে দাদার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। অফিস থেকে ফিরে বাবাকে বাড়ির ভেতর দেখে ছেলেও অবাক হয়ে গেল। মনে হলো, যেন সে স্বপ্ন দেখছে।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? বাবা বাড়ির ভেতর আসলেন কীভাবে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এরপর মহিলা স্বামীকে ছোট ছেলের আঁকা ছবি এবং তাঁর মুখের কথাগুলো খুলে বলল। সবকিছু শুনে স্বামী খুব খুশি হলো।

বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ মা-বাবাই আমাদের কাছ থেকে হোক বা আমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে হোক—ভালো আচরণ পান না। অনেক সন্তান বাবা-মায়ের আনন্দ-বেদনার কথা চিন্তাও করে না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা কখনোই একাকী থাকতে চান না; বরং সন্তান ও নাতি-নাতনিদের সাথে থাকতে চান।

বাবা-মায়ের স্মৃতি

সালটা ১৯৮২। নিজের জন্মভূমি ছেড়ে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছি আজ প্রায় পনের বছর। আমার মা এবার প্রথম হজে আসছেন বলে সময়টা আমার কাছে খুবই অন্যরকম। আমার মামা আর বড় খালার সাথে হজের ঠিক দুদিন আগে মা সৌদি আরবে এসে পৌঁছলেন। আমি তখন রিয়াদের প্রতিরক্ষা ও বিমান মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতাম। খুব ইচ্ছে ছিল মাকে নিজে গিয়ে বিমানবন্দর থেকে রিসিভ করব, কিন্তু বিশেষ একটি কারণে জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে সেদিন আর মাকে রিসিভ করতে যেতে পারলাম না। সৌদি আরব আসার পর থেকে পনের বছর ধরে আমি মাকে দেখি না। সেদিনের প্রতিটা সময় আমার যে কীভাবে কেটেছে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। সারাক্ষণ আমার হৃদয় মায়ের জন্য ছটফট করত। ইচ্ছে করছিল সবকিছু ছেড়ে মায়ের কাছে ছুটে আসি। মাকে জড়িয়ে ধরে বলি—তাঁকে আমি কত কত মিস করেছি। মাথার উপর দিয়ে বিমান যাওয়ার শব্দ পেলেই বুকের ভেতরটা ধপ করে উঠত আমার।

অফিসের কাজ শেষ করে তড়িঘড়ি জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম; কিন্তু সেখানে মাকে খুঁজে পেলাম না। এরপর ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করলাম। জানি না এ বিশাল মক্কায় তিনি কোথায় আছেন!

মাসজিদুল হারামের একটি দরজার নাম বাবে বিলাল। দরজাটিতে প্রায়ই ভারত-পাকিস্তান থেকে আগত আলিমগণ এসে জমা হতেন। সেখানে প্রায়ই

পাওয়া যেত হাফিয মুহাম্মাদ ফাথিকে। তিনি অন্ধ মানুষ; কিন্তু কী বিশাল অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন আল্লাহ তাঁকে, স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ, স্পর্শ করেই বলে দিতে পারতেন মেলানো হাতটি কার। কাবায় ঢুকতে গিয়ে দেখি বাবে বিলালের দরজায় হাফিয ফাথি বসা। হাত ধরতেই চিনে ফেললেন। বললেন, ‘আবদুল মালিক, আপনি এসেছেন? আপনার মা আপনার জন্য হারাম শরীফের সিঁড়িতে অপেক্ষা করছেন।’

মা কোথায় আছেন সেই তথ্য তাঁর কাছে জানার পর মায়ের সাথে দেখা করতে ছুটে গেলাম হারাম শরীফের সিঁড়ির দিকে। এসে দেখি মা আমার বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছেন। কাছে যেতেই তিনি চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন নিবিড়ভাবে। আমি মায়ের হাতে চুমু খেলাম। মনে হলো এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে যেন শুধু আমরা দুজন—মা আর সন্তান। চারপাশের কোনো কিছুতে আমাদের কোনো খেয়াল ছিল না। ১৫ বছর পরে দেখা—খুশিতে অঝোরে কাঁদছি দুজনেই। মাথা নিচু হয়ে গেল সেই আল্লাহর প্রশংসায়—যিনি আমার মাকে হজ করানোর মাধ্যম হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছেন। মা-ও কাঁদছেন আর শুকরিয়া করছেন যে আল্লাহ তাঁকে হজ করার তাওফীক দিয়েছেন। আমি মায়ের কাছে দুআ চাইলাম। তখনই তিনি হাত তুললেন আল্লাহর কাছে। সময় পেরিয়ে গেল অনেকটা। মা আমার জন্য দুআ করছেন আর আমি সেই দুআর সাথে সাথে ‘আমীন’ বলছি। সেটাই ছিল মায়ের সাথে আমার প্রথম হজ। আল্লাহর দয়ায় এরপর অনেকবার তাঁর সাথে হজ এবং উমরাহ করার সুযোগ পেয়েছি।

অন্যসব সন্তানের মতো আমিও বাবা-মায়ের অনেক আদরের ছিলাম। ছোটবেলা থেকে তাঁদের ভালোবাসায় আমার বেড়ে ওঠা। আমরা ছিলাম তিন ভাই। মুহাম্মাদ আইয়ুব বড়, মুহাম্মাদ তারিক শাহীদ ছোট। আমার চেয়ে ছোট কিন্তু মুহাম্মাদ এর চেয়ে বড় আরেকজন ভাই ছিল আমাদের, সে শৈশবেই মারা যায়।

সাধারণত সবচেয়ে ছোট বা সবচেয়ে বড় সন্তানটি বাবা-মায়ের বেশি প্রিয় হয়; কিন্তু আমি জানি না তিন ভাইয়ের মধ্যে কাকে বাবা-মা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। মনে হয় সবাই বলবে সে-ই সবচেয়ে প্রিয়; কিন্তু আমার কেন জানি একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমি-ই তাঁদের সবচেয়ে পছন্দের। আমার বড় হয়ে ওঠা, পড়াশোনাতে তাঁদের ভূমিকা বিশাল। তাঁদের জন্য আমার বুকের গভীরে ভালোবাসার বিশাল সাগর আছে, আছে সম্মানের সুউচ্চ হিমালয়। আজকের এই আমি—এর পেছনে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ রাহমাত, বাবা-মায়ের দুআ এবং পরিশ্রম, আলহামদু লিল্লাহ। তাঁরা মারা গেছেন অনেকদিন হলো; কিন্তু আমার বুকের ভেতরে তাঁদের স্মৃতিগুলো এখনো সতেজ, স্পষ্ট আর উজ্জ্বল।

আমার ওপর আল্লাহর বিশেষ রাহমাত যে একটি ধার্মিক পরিবারে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। শৈশবেই মা আমাকে কুরআন পড়া শেখান। তিনি খুব বেশি শিক্ষিত ছিলেন না, তবে কুরআন পড়তে পারতেন। এছাড়াও তিনি হাফিয বারাকাল্লাহু লাখভি ও জিনাতে-ইসলামের বই পড়তেন। মা

তাঁর সাথিদের সাথে চরকায় সুতা বুনতেন আর একে অন্যকে বই পড়ে শোনাতেন। সে সময়ের কিছু কবিতা এখনো মনে পড়ে।

চতুর্থ শ্রেণিতে থাকতে আমি কুরআন পড়তে শিখি। এরপর বাবা খুব সুন্দর করে অর্থসহ কুরআন শিখিয়েছেন। সপ্তম শ্রেণিতে আমি কুরআনের অনুবাদ শেষ করি। ফজর সালাতের পর বাবা আমাকে আর আমার বড় ভাইকে পড়াতেন। তিনি আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসলেও পড়া শেষ না করলে ছুটি দিতেন না। বাবার কাছে পড়া দেওয়ার পরেই কেবল সকালের নাস্তা পেতাম। মা একটু পর পর রান্নাঘর থেকে উঁকি দিতেন—পড়া শেষ? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে খাবার পেতাম; নইলে খালি পেটেই স্কুলে যেতে হতো। তবে এমনটি খুব কমই ঘটত। খালি পেটে স্কুলে যাওয়ার ভয়ে আমি ঠিকমতো পড়া শেষ করতাম।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারে বাবা-মা ছিলেন আরও কঠোর। বাবা বাড়ি এসেই মায়ের এবং আমাদের সালাতের খবর নিতেন। সালাত না আদায় করলে তখনই ওযূ করে সালাত আদায়ে বাধ্য করতেন। তাঁদের প্রতি আল্লাহ রাহমাত বর্ষণ করুন। আমি কোনো ভুল করলেও বাবা আমাকে ভালোবাসতেন; কিন্তু যখন শিক্ষা দিতেন, ভুলগুলো ছাড় দিতেন না।

আমার মা ছিলেন রাজপুত গোত্রের মেয়ে। ইসলামের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি আমাদের সাথে নরম আচরণ করতেন। শৈশবের অনেক স্মৃতি এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছোটবেলায় আমি কিছুটা দুষ্টু ছিলাম। একবার গর্বভরে নিজেকে বড় প্রমাণ

করতে গেলে মা আমাকে খুব করে শাসিয়েছিলেন। অহংকার করার পরিণতি যে কত ভয়াবহ হতে পারে, সে ব্যাপারে মা আমাকে সেদিন বুঝিয়েছিলেন। এরপর থেকে আমি আর কখনোই নিজেকে নিয়ে বড়াই করিনি।

সেদিন মাসজিদুল হারামে মা আমার জন্য অনেক দুআ করলেন। আমার বিয়ের দুবছর পর মা সৌদি আরবে আসেন। এরপর তিনি প্রায়ই এখানে আসতেন, আবার চলে যেতেন; কিন্তু তিনি কখনো সৌদি আরবে থাকার স্বপ্ন দেখেননি। ভিসা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছিল; কিন্তু তারপরও মা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি।

আমার বিশ্বাস আমার যা কিছু সফলতা তা আল্লাহর অনুগ্রহের পর আমার মায়ের দুআর কারণেই। ১৯৬৭ সালে হাফিজাবাদে 'দুয়াবা চালের মিল'-এর কর্মচারী হিসেবে আমার কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। রাত ১২ টায় কাজ শেষ হতো। আমাদের বাড়ি ছিল সেখান থেকে তিন মাইল দূরে। বাড়ি আসতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগত। শীতকালে যখন আমি বাড়ি ফিরতাম, দেখতাম মা তখনো দরজা খুলে অপেক্ষা করছেন। রাতে জেগে থাকলে মা অসুস্থ হয়ে যাবেন বলে আমি রাতে মিলে থাকার ব্যবস্থা করলাম। ফজরের সালাতের পর বাড়ি যেতাম, দেখতাম বাবা-মা দুজনই উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁদের সারাদিনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার কথা বলতাম। কিছুক্ষণ অবস্থান করে সকালে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসতাম।

আমি তখন হাফিজাবাদে একটি ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ছিলাম। দুয়াবা চালের মিলের কর্মচারী-সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। জীবন

ছিল কর্মব্যস্ত। একদিন মা জানান তিনি হজ করতে চান। আমাকে বললেন, ‘তুমি সৌদি আরবে যেতে পারলে এই ফরয ইবাদাতটা করতে পারতাম।’ আমি সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। এরপর সহজেই সেখানে যাওয়ার একটা সুযোগ এসে গেল। কোনো নতুন স্থানে প্রত্যেকেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়; তারপর আল্লাহর রাহমাতে একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো। শুরুতে আমার খুব কষ্ট হতো। তখন আমি একদিন পর পর বাবা-মাকে চিঠি লিখতাম। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাবা আমার চিঠির বিস্তারিত উত্তর দিতেন।

যে সময়ের কথা বলছি তখন সৌদি আরবে বসবাসের অনুমতি ‘ইকামা’ পাওয়া কঠিন ছিল।১ [[১] সৌদি প্রশাসন কর্তৃক ভিনদেশী নাগরিকদের সৌদি আরবে অবস্থানের প্রশাসনিক অনুমতিপত্রকে ইকামা বলা হয়।] প্রতিরক্ষা ও বিমান মন্ত্রণালয়ের যেখানে চাকরি করতাম তাঁর প্রধান ছিলেন কর্নেল ফয়সাল বিন মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ আল-কাবীর। আমাকে বেশ পছন্দ করতেন তিনি, অনেকবার পুরস্কৃতও করেছেন। অফিসে এসে তিনি আমার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করতেন। তিনি ক্যালিগ্রাফি খুব পছন্দ করতেন। আর আমার কাজ ছিল ক্যালিগ্রাফি করা। একদিন আমি তাঁর কাছে মায়ের জন্য একটি সৌদি ভিসা চাইলাম। তিনি বললেন ব্যবস্থা করে দেবেন। কিছুদিন পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভিসার নিবেদন করার সুযোগ হলো। তিনি আমাকে দরখাস্ত করতে বললেন; কিন্তু আমি আরবী লেখায় ততটা পটু ছিলাম না। এরপর তিনি নিজেই আমাকে একটি দরখাস্ত লিখে দেন। আমাকে বললেন আমি যেন নিজ হাতে লিখে এটি জমা দিই।

আমি দরখাস্তটির ক্যালিগ্রাফি করলাম। এটি ছিল আমার জীবনে ক্যালিগ্রাফি করা সবচেয়ে সুন্দর দরখাস্ত—যেন কাগজে ছড়ানো মুক্তো। অফিসের সবাই আলোচনা করতে লাগল আমার মায়ের সৌদি আসা নিয়ে। মনে হলো তিনি কেবল আমার মা নন, অফিসের সবারই মা। এর মধ্যেই একদিন যুবরাজ নাইফ বিন আবদুল আযীয আল-সাউদের সাথে কর্নেল ফয়সাল দেখা করলেন। আমার দরখাস্তটি দেখে যুবরাজ বললেন এত সুন্দর ক্যালিগ্রাফি তিনি কখনোও দেখেননি। তিনি তখনই দরখাস্তটি মঞ্জুর করলেন। পরদিন অফিসের সবার মুখজুড়ে হাসি—আবদুল মালিকের মা ভিসা পেয়ে গেছেন।

আমার ছেলে ওকাশার জন্ম হিজরী ১৪০৪ সালে। ওর বয়স যখন মাত্র এক সপ্তাহ, মা সৌদি আরবে এলেন। স্ত্রীকে সাথে নিয়ে মাকে আনতে বিমানবন্দরে গেলাম। মা কোলের শিশুসমেত স্ত্রীকে দেখে বললেন—ওদের নিয়ে আসা উচিত হয়নি। তাঁর বৌমাকে তিনি একটুও কষ্ট দিতে চান না। যখন থেকে মা আমাদের সাথে থাকা শুরু করলেন, বাড়িতে যেন অন্যরকমের একটা শান্তি নেমে এলো। তিনি পাকিস্তান থেকে প্রায়ই এখানে আসতেন। আবার কিছুদিন পরে দেশে ফিরে যেতেন। তখন টেলিফোনে কথা বলাও ছিল কঠিন। সংযোগ পেতে প্রায় আধঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট সময় লাগত। ফজরের সালাতের পর কিছুটা সহজে সংযোগ পাওয়া যেত। যখন মা এখানে থাকতেন না, আমি ফোনে তাঁর থেকে পরামর্শ নিতাম। কাকে আমার সাহায্য করা উচিত—টাকা দেবো, না প্রতিদিনের খাবারটা দেবো, কারও বিয়েতে কী উপহার দেবো, এমনকি কুরআন মুখস্থের পরে হাতঘড়ি উপহার দেওয়ার মতো ছোট্ট বিষয়গুলোতেও মায়ের সাথে পরামর্শ

করে নিতাম। আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলাম—মাকে কখনো 'না' শব্দটি বলব না। কোনো কিছু যদি সামর্থ্যের বাইরে হয়, আমি মায়ের কাছে দুআ চাইব সেই আদেশ পালনে আল্লাহ যেন আমাকে সক্ষম করেন, তবু 'না' কথাটা মুখ দিয়ে বের করব না।

মা মাসজিদ ও মাদরাসা খুব পছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমাকে ফোনে বললেন, 'ম্যানেজার সাহেব, আমার কুরআনের এতগুলো কপি চাই।' মায়ের এরকম আবদার শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর বললাম, 'মা, তুমি এসব কী বলছ?'

'দারুস সালাম' কীভাবে এত বড় হলো? এর পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকলেও আমার মায়ের দুআর বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি যখনই ফোনে আমাকে কোনো নির্দেশ দিতেন, আমার খুশিতে বুক ভরে যেত আর দুআ চাইতে থাকতাম। একদিন মায়ের সাথে ফোনে কথা বলছি, দুষ্টুমি করে বললাম, 'এখন মহারাণীর হুকুম দেওয়ার পালা!' মা বিশাল তালিকা ধরিয়ে দিলেন। আলহামদু লিল্লাহ, সবগুলোই জোগাড় করে দিলাম। এরপরে যখন মায়ের সাথে কথা হলো তিনি বুকভরে দুআ করলেন। কথা শেষে আমার স্ত্রীকে আমি বললাম, 'আনিসা, আমাদের জন্য আজ কল্যাণ ও বরকতের দরজা খুলতে যাচ্ছে।'

— 'কীভাবে?'

আমি তাঁকে বোঝালাম মা আজ খুব খুশি হয়েছেন। আমাদের জন্য তিনি অনেক দুআ করেছেন। তারপর তা-ই ঘটল। অফিসে যাওয়ার পর ধর্ম

মন্ত্রণালয় থেকে ফোন এলো। অনেকদিন আগে কুরআনের হাউসা ও বসনিয়ান অনুবাদ ছাপানোর জন্য দরপত্র জমা দিয়েছিলাম। এই প্রকল্পের খরচ ছিল প্রায় ২৪ লক্ষ রিয়াল। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পটির খরচ দেবেন যুবরাজ ওয়ালিদ বিন তালাল আল-সাউদ। এই দরপত্রের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মন্ত্রণালয় থেকে মুহাম্মাদ আল-জাইর ভাই আমাকে সুখবরটা জানালেন। এভাবেই দারুস সালাম বড় পরিসরে কাজ শুরু করে। সেদিন সত্যি আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দরজা খুলে গিয়েছিল।

একদিন মা আমার স্ত্রীর ওপর খুশি হয়ে তাঁর জন্য দুআ করলেন, ‘আল্লাহ তোমাকে সাতটি ছেলে দান করুন।’ আমার স্বদেশ পাঞ্জাবের মায়েরা প্রায়ই কন্যা ও ছেলের স্ত্রীদের এই দুআ করেন। আমার মায়ের আন্তরিক দুআ সর্বশক্তিমান আল্লাহ কবুল করলেন। তিনি আমাকে সাতটি ছেলে দিয়ে ধন্য করেছেন। আমার একটি সন্তান উবাইদুল্লাহ শৈশবেই মারা যায়। আমার জানামতে আমার বংশের আর কারও ছয় ছেলে নেই।

আমার অনেক সৌভাগ্য যে বাবা-মা আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আমিও তাঁদের অনেক সম্মান করতাম। আজ আমার এই মর্যাদার কারণ আল্লাহর বদান্যতা ও পিতা-মাতার দুআ। আমার বাবা-মা আমাকে শুধু স্নেহই করতেন না—মানুষ হিসেবে সম্মানও করতেন। তাঁদের সন্তান হতে পেরে আমি ধন্য, আলহামদু লিল্লাহ। আমি প্রতিদিন তাঁদের জন্য দুআ করি। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

সিলাহ রেহমি

বাবা-মাকে খুশি করার জন্য মানুষের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। যেসব সহজ উপায়ে মা-বাবার মন জয় করা যায় তার অন্যতম হলো তাঁদের বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এই প্রথাকে ইসলামে 'সিলাহ রেহমি' বলে। নরম ও ভদ্র ভাষায় বয়স্কদের সাথে কথা বলা, সম্মানের সাথে তাঁদের সম্বোধন করা সিলাহ রেহমির অংশ। যেমন : তাঁদের সাথে কথা বলার সময় শুধু চাচা না বলে সাথে প্রিয়, সম্মানিত বা শ্রদ্ধেয় শব্দগুলো যুক্ত করা যায়। আবার শুধু চাচা বলার সময় কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা এবং শ্রদ্ধাবোধও ফুটিয়ে তোলা যায়।

আমাদের সমাজে সাধারণত বাবার পক্ষের পুরুষ বয়োজ্যেষ্ঠদের চাচা বলা হয়। আর নারীদের ফুফু বলে সম্বোধন করা হয়। তেমনই মায়ের পক্ষের পুরুষ আত্মীয়দের মামা এবং নারীদের খালা বলা হয়। সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমাদের উচিত বাবা-মায়ের স্বজনদের ভালোবাসা, তাঁদের সম্মান করা এবং সম্ভব হলে কিছু উপহার দেওয়া। এ কাজগুলো নানাভাবে করা যায়। যেমন : মায়ের ঘরের আলমারিতে কিছু চকলেট, বিস্কুট বা হালকা খাবার এবং ছোটখাটো খেলনা রেখে দেওয়া। নাতি-নাতনিরা এলে তিনি তাঁদের সেখান থেকে কিছু দিতে পারবেন। এতে করে তাঁর ও নাতি-নাতনিদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। কিছুদিন আগেও দেখা যেত বৃদ্ধারা লাড্ডু আর গুড় লুকিয়ে রাখতেন। শিশুরা যখন বেড়াতে আসে, তখন তারা

সেগুলো শিশুদের খেতে দিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই প্রথাগুলোকে হারিয়ে ফেলছি। অথচ এগুলোই ছিল আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি। এসব ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা কোনো কঠিন কাজ না। প্রবীণদের চেয়ে আমাদের কাছে উপহার দেওয়ার উপকরণ অনেক বেশি।

আমাদের বাবা-মা অন্য কোনো শহরে বেড়াতে গেলে আমাদের উচিত তাঁদের সাথে যাওয়া। এতে করে আমরা তাঁদের সাহায্য করতে পারব। যদি তা করা সম্ভব না হয়, তবে প্রতিদিন ফোন করে তাঁদের খোঁজ নিতে হবে। এতে তাঁরা সম্মানিত হবেন। তাঁরা গর্ব করে অন্যদের বলতে পারবেন যে তাঁদের সন্তান তাঁদের যত্ন নেয়, তাঁদের ভালোবাসে, ফোন করে সবসময় তাঁদের খোঁজখবর নেয়।

আমাদের কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা কোনো দুঃসংবাদ থাকলে খুব সতর্কতা ও ধৈর্যের সাথে বাবা-মাকে বলতে হবে। আমরা বলব, 'চিন্তা করবেন না, ইন শা আল্লাহ, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শান্ত থাকুন। আল্লাহর রাহমতে সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। শুধু আমার জন্য দুআ করেন।'

কোনো কারণে স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি হলে বাবা-মাকে না বলাই ভালো। সন্তান বাবা-মায়ের খুব প্রিয়, খুব আপন। সন্তানের বিষণ্ণতা তাঁদের কষ্ট দেয়। একারণে দাম্পত্য জীবনের ছোটখাটো সমস্যার কথা তাঁদের বলা উচিত না। বাবা-মাকে না জড়িয়ে এসব সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করা উচিত।

অহেতুক মায়ের সামনে স্ত্রীর অতিরিক্ত প্রশংসা করা উচিত নয়। স্ত্রীকে দেওয়া উপহারের তালিকা মায়ের কাছে গর্ব করে বলাতে কোনো উপকার নেই। আমাদের ভাবা উচিত বিয়ের আগে মা কত আপন ছিলেন। সব ঘটনা, সব সমস্যা বলার জন্য আমরা মায়ের কাছেই ছুটে যেতাম। হঠাৎ একটি মেয়ে বউ হয়ে বাবা-মা এবং সন্তানের মাঝে চলে এলো। এখন মা সন্তানকে অল্প সময়ও কাছে পান না। স্ত্রীর যেমন স্বামীর ওপরে অধিকার আছে, তেমন মায়েরও আছে সন্তানের প্রতি অধিকার। দুজনের অধিকারই রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। স্ত্রী এবং মায়ের মধ্যে যেন ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় সে চেষ্টা করতে হবে আমাদের। দুজনকেই সময় দিতে হবে। মা যেন মনে না করেন বিয়ের পর তিনি বঞ্চিত বা উপেক্ষিত হচ্ছেন। বিয়ের পর ভাইবোনদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ভাইবোনদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হলে মাকে সেটা কষ্ট দেয় বৈকি।

বাবা-মায়ের ইসলামী জ্ঞান না থাকলে আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তাঁদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ভালোভাবে তাঁদের সেবা করতে হবে। তাঁরা কম জানেন, একথা কখনোই বলা যাবে না। সতর্ক থাকতে হবে তাঁদের সম্মানহানি যেন কোনোভাবেই না হয়। নির্ভরযোগ্য কোনো ইসলামী বই তাঁদের দেওয়া যায়। আলিমদের রেকর্ড করা বক্তব্য শুনতে দেওয়া যায়। কোনো ইসলামী আলোচনা অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া যায়। এভাবে বাবা-মাকে দ্বীনের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা যায়।

সামর্থ্য থাকলে তাঁদের হজ ও উমরাহ করতে পাঠানো মধ্যবিত্ত বাবা-মায়ের প্রতি মুসলিম সন্তানের কর্তব্য। একাকী না পাঠিয়ে আমাদের উচিত তাঁদের সাথে যাওয়া; সাহায্য এবং সেবাযত্ন করার এ এক বিশাল সুযোগ। হজ একটি কঠিন ও ক্লান্তিকর কাজ। নারীদের জন্য তা আরও কষ্টকর। এ সময় বাবা-মাকে পাহারা দিয়ে আগলে রাখা, পথ দেখানো, খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা সন্তানের কর্তব্য। আমাদের কথা ও কাজ দিয়েই প্রমাণ করতে হবে যে আমরা তাঁদের ভালোবাসি, তাঁদের সেবা করতে পছন্দ করি।

কোনো শোক সংবাদ পেলে তৎক্ষণাৎ বাবা-মাকে জানানোর দরকার নেই। চিন্তাভাবনা করে সঠিক সময়টা বেছে নিতে হবে। তাঁদের কাছে গিয়ে নরম স্বরে কিন্তু দৃঢ় চিত্তে খারাপ খবরটা দিতে হবে। তাঁদের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাছাকাছি বসে কথা বলতে হবে। কথার শুরুতেই ধৈর্যের গুরুত্বকে তুলে আনা দরকার। ধৈর্যধারণের যে বিশাল প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে—সেটি মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। যখন তাঁরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হবেন, তখন দুঃসংবাদটি দিলে তাঁরা বেশি ভেঙে পড়বেন না।

মানুষ বৃদ্ধ হতে চায় না। কেউ তাঁকে বৃদ্ধ বললে তা সে পছন্দ করে না। নারী-পুরুষ সকলেই ইতিবাচক কথা ও সম্মানসূচক সম্বোধন শুনতে পছন্দ করে। বাবা-মাকে সবসময় বলা উচিত, ‘মা-শা-আল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছেয়) আপনি এখনো তরুণ আছেন, আসল বয়সের চেয়ে অনেক কমবয়সী মনে হয়। চেহারা অনেক প্রাণবন্ত ও সতেজ। আলহামদু লিল্লাহ, আপনারা এখনো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, গলার স্বর বলিষ্ঠ। কোথাও কোনো অসুস্থতার ছাপ

দেখা যাচ্ছে না।' এমন উৎসাহব্যঞ্জক কথায় বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষও মনে জোর পায়, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে যায় ১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মতো সিরিয়া ভ্রমণের কথা। দুজন সৌদি বন্ধুর সাথে গিয়েছিলাম সিরিয়ার একটি গ্রামে। গ্রামপ্রধান তাঁর বাড়িতে আমাদের আতিথেয়তা করলেন। আমরা বসেছিলাম বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত একটি বিশাল ঘরে। সৌদি আরব থেকে মেহমান এসেছে শুনে গ্রাম ভেঙে মানুষেরা দেখা করতে এলো আমাদের সাথে। এর মধ্যে কিছু মানুষ ছিলেন যাদের বয়স সত্তর-আশি কিংবা তারও বেশি। বৃদ্ধদের এই দলটি ঘরে ঢোকার সাথে সাথে একজন বলে উঠল, 'মা-শা-আল্লাহ! যুবকেরা এসে পড়েছেন।' 'যুবক' উপাধিটি শোনা মাত্র বৃদ্ধদের লাল চেহারা আরও লাল হয়ে গেল। সিরিয়ার সেই বুড়ো মানুষগুলোর ফর্সা-সুন্দর ত্বকের লালচে আভা যেন আজও আমার চোখে লেগে আছে।

আমাদের বাবা-মায়েরাও মানুষ; প্রশংসা পেলে তাঁরাও খুশি হন। সুন্দর, নতুন একটা পোশাক পরলে তাঁদের পরিমিত প্রশংসা করা যায়, কাপড়টা তাঁদের যে বেশ মানিয়েছে তা জানিয়ে দেওয়া যায়। তাঁদের ভালো কাজগুলোর প্রশংসা করে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। বাবা-মা সন্তানদের কণ্ঠ ভালোবাসেন। তাঁদের প্রিয় কোনো কবিতা থাকলে তা আবৃত্তি করে শোনালে তাঁদের ভালো লাগবে। যাদের কণ্ঠস্বর, গানের গলা সুন্দর তাঁরা বাবা-মাকে তাঁদের প্রিয় কোনো ইসলামী গান শোনাতে পারেন। ছোটবেলায় বাবা-মাকে কবিতা শোনালে তাঁরা খুবই খুশি হতেন। একটু বড় হওয়ার

পর তাঁদের হাসাতে কৌতুক বলতাম। আমি কখনোই তাঁদের বুঝতে দিইনি যে তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন; বরং সবসময় তাঁদের মধ্যে এই বোধটি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি যে তাঁরা আগের মতোই আছেন : সুস্থ, সচল, সবল।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুলনা খুব ক্ষতিকর। নিজের বাবা-মাকে অন্য কারও বাবা-মায়ের সাথে তুলনা করাটা নিচু মানসিকতার পরিচয়। কে কার সন্তানদের খাওয়া-পরার ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, নামী-দামী স্কুলে ভর্তি করেছে—এ ধরনের কথা ভুলেও মা-বাবার সামনে বলা যাবে না। এমন মন্তব্যে তাঁরা কষ্ট পাবেন, বুঝতে পারবেন আসলেই তাঁরা সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতীতের ভালো জিনিসগুলো ছাড়া অপ্রিয় প্রসঙ্গ, আক্ষেপ এড়িয়ে চলতে হবে, ভুলে যেতে হবে। সবসময় মা-বাবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতে হবে। প্রতিদিনের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো মজার ঘটনা, উল্লেখযোগ্য কিছু মা-বাবাকে বলা যায়। এতে ঘরের পরিবেশ আরও বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দময় হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো বাবা-মাকে জানানো দরকার। বাবা-মা উচ্চশিক্ষিত হলে বিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর নিঃস্বার্থ বিশ্লেষণ পাওয়া সম্ভব। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বাবা-মায়েরা সঞ্চয় করেন গভীর জ্ঞান। সুতরাং যতটা সম্ভব তাঁদের থেকে শেখার চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, কোনো বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে বাবা-মা খুশি হন; এতে সম্পর্ক গভীর হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত বাবা-মা চান সন্তান যেন তাঁদের চেয়েও বড় হয়, উন্নতি করে। তাঁদের কাছে সব কথা খুলে বললে তাঁরাও আমাদের কাছে কিছু গোপন করবেন না।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমার সন্তানদের আমি ন্যায়নিষ্ঠতার গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়েছি। আমি তাঁদের সুদ নেওয়া বা অন্যদের ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছি। সঠিক সময়ে সালাত আদায় করতে বলেছি। আমার উপদেশ শুনে তারা বলেছে, 'বাবা, আপনার প্রতিপালন সার্থক হোক। ইন শা আল্লাহ আমরা কখনো আপনার বিশ্বাস ভঙ্গ করব না।' আমি আনন্দিত হয়েছি বারবার তাদের এ ওয়াদা শুনে যে তারা কখনো বিপথে যাবে না।

সন্তানের সদাচরণ বাবা-মাকে যতটা আনন্দ দেয় ততটা অন্য কিছুই দেয় না। আমরা স্বীকার করি আর না করি, এটাই সত্য যে আমাদের সফলতা বাবা-মায়ের প্রতিপালন ও সুশিক্ষার সুফল। সন্তানের জন্য বাবা-মা সম্ভবপর সবকিছু করেন। ধনী হোক আর গরীব হোক, সন্তানের জন্য তাঁরা সামর্থ্যের বেশি চেষ্টা করেন। এই দুনিয়াতে তাঁদের চাওয়া একটাই—সন্তানের সাফল্য। তাঁরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে—এটাই তাঁদের স্বপ্ন। এই লক্ষ্যে কাজ করে তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, আমরা বড় হয়েছি। আমাদের উচিত তাঁদের শ্রম ও উৎসর্গকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তাঁদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা। এতে আমাদের পিতা-মাতা যেমন খুশি হবেন, আল্লাহও তেমনই খুশি হবেন।

সহানুভূতির সত্য রূপ

আটপৌরে জীবনে অভ্যস্ত একটা মেয়ে। পেশায় একজন নার্স। জীবনটাকে নিজের মতো করেই দেখতে ভালোবাসে। নিজেকে ধরাবাঁধা জীবনের বাইরের বাসিন্দা ভাবতেই সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অন্য ধর্মের হওয়ায় ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না সে।

সারাদিন হাসপাতালের কাজ শেষ করে বাসায় এসে টিভি দেখা, গান শোনা—এই গণ্ডিতেই আবদ্ধ তার জীবন। গান যেন তার জীবনের সবটা জুড়ে। একদিন টিভি দেখার সময় চ্যানেল বদলাতে বদলাতে হঠাৎ চোখ আটকে যায় একটি অনুষ্ঠানে। ইসলাম নামের একটি ধর্ম নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে সেখানে। মেয়েটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকল ঠিকই, কিন্তু আকর্ষণীয় কিছুই পেল না সেদিন; বরং অনেক কিছুই অর্থহীন মনে হলো তার কাছে। টিভি বন্ধ করে উঠে গেল সে।

কিছুদিন পরের কথা। এক মুসলিম দম্পতি অসুস্থ এক বৃদ্ধাকে নিয়ে হাসপাতালে এলো। বৃদ্ধার দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল মেয়েটির ওপর। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল বৃদ্ধার অসুস্থতার ব্যাপারে দম্পতিটি খুবই স্পর্শকাতর। অসুস্থ শাশুড়ির পাশে সারাদিন ভদ্রলোকটির স্ত্রী মন খারাপ করে বসে থাকেন। কখনো কখনো তাঁর গাল বেয়ে অশ্রুও গড়িয়ে পড়ে। নার্সটি মনে মনে ভাবে—অনর্থক কান্না। কথা বলার কোনো ইচ্ছে না থাকলেও কাঁদতে দেখে সে একদিন জিজ্ঞেসই করে বসল:

‘কাঁদছেন কেন? মানুষ রোগাক্রান্ত হবে, আবার সুস্থ হবে। এটাই তো স্বাভাবিক।’

— ‘আমার শাশুড়ি মা গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় আমরা তাঁর চিকিৎসার জন্য দেশ ছেড়েছি। দেশে তাঁকে অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে—লাভ হয়নি। তাই আমেরিকায় আসা। তিনি আমার মায়ের মতোই। তাঁর অসুস্থতা আমাকেও বেশ কষ্ট দিচ্ছে। এই ব্যর্থতাই আমাকে কাঁদাচ্ছে যে আমরা আমাদের সাধ্যের সব চেষ্টা করেও তাঁর কষ্ট কমাতে পারছি না।’

এ কথাগুলো নার্স মেয়েটিকে ভীষণ ধাক্কা দিল। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল মেয়েটিকে নিয়ে—কেবলমাত্র শাশুড়ির সুচিকিৎসার জন্য সে স্বামীর সাথে বিদেশে এসেছে, প্রতি মুহূর্ত জেগে আছে, পাশে বসে আছে। অথচ আমি আমার নিজের মায়ের জন্যেও এত কিছু করার কল্পনা করতে পারি না। এমনকি মা এখন কেমন আছেন তাও আমার জানা নেই। আমি আমার গর্ভধারিণী মায়ের প্রতিই এতটা উদাসীন, আর শাশুড়ি হলে কী করতাম!’

সে মনে মনে হিংসে করতে শুরু করল বৃদ্ধাকে। পরিবারের কাছ থেকে কী অপূর্ব ব্যবহার পাচ্ছে সে। আমি যদি ওই বৃদ্ধা হতাম, তবে আমার পরিজনরাও কি এভাবেই আমার যত্ন নিত? বৃদ্ধা একজন মুসলিম। মুসলিমরা কি পরিবারের সদস্যদের প্রতি এতটাই সহানুভূতিশীল? কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠল সে।

হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর থেকেই বারবার দেশ থেকে ফোন আসে। স্বদেশ থেকে স্বজনেরা তাঁদের সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছে। অসুস্থ বৃদ্ধার সুস্থতার খবর নিচ্ছে। সহানুভূতি জানাচ্ছে, দুআ করছে।

একদিন নার্স মেয়েটি দেখে ভদ্রলোকের স্ত্রী একা বসে আছেন। কেন জানি আজ মেয়েটির সাথে বড্ড কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। বিনয়ের সাথে তাকে কাছে ডাকল সে। জানতে চাইল তার নানা বিষয়ে। কথায় কথায় অনেক কিছু জানতে চাইল সে—ইসলাম সম্পর্কে, পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে। ইসলামের অমেয় বাণীর সাথে ভালো লাগার সম্পর্কের সেটিই তার প্রথম দিন।

সে নিজ চোখে দেখতে লাগল কীভাবে দম্পতিটি বৃদ্ধার সেবা করছেন। তাঁর পাশে তারা সারা রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। মায়ের অবস্থার উন্নতি হলে তাঁদের মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করত। আবার অবস্থার অবনতি হলে তারা বিষণ্ন হয়ে যেতেন। একদিন সেই বৃদ্ধা মারা গেলেন। এতে ছেলে ও তার স্ত্রী দুজনই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ তারা শিশুর মতো কাঁদছিলেন।

এই ঘটনার পর ইসলাম সম্পর্কে নার্স মেয়েটির দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পাল্টে যায়। সে ইসলাম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা শুরু করে এবং পরিশেষে ইসলাম গ্রহণ করে। তার ভাষায়:

‘পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা ও বৃদ্ধার প্রতি দম্পতিটির যত্নই আমাকে ইসলামের নিকটবর্তী করেছে। একটি ইসলামী কেন্দ্র থেকে পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কিত একটি বই সংগ্রহ করেছিলাম।

আমি যতই পড়েছি, ততই ইসলামের নিকটবর্তী হয়েছি। পড়ার সময় আমি নিজেকে এক বৃদ্ধা মা হিসেবে কল্পনা করেছি। আমার মনে হয়েছে চারদিকে সন্তানরা আমার সেবা করছে, আমাকে ভালোবাসছে। আমি ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করতে লাগলাম। অতঃপর আমি ইসলামে দীক্ষিত হলাম। প্রজ্ঞাময় ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ ভাণ্ডার না দেখে শুধু পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে জেনেই আমি মুসলিম হয়েছি।'

কুরআন ও হাদিস থেকে নেওয়া

ইবরাহীম(আলাইহিস সালাম)-এর নম্রতা

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন সত্যবাদী নবী—যিনি কথায় ও কাজে কখনো বিপরীত করেননি। তিনি তাঁর মূর্তিপূজক বাবাকেও নম্রভাবে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করেছিলেন এবং মূর্তিপূজা করার কারণে তাঁর সাথে কোনো কর্কশ ভাষা ব্যবহার করেননি; বরং নম্র ভাষায় বললেন:

"হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন কিছুর ইবাদাত করেন, যে কোনো কিছু শোনে না, দেখে না এবং কোনো উপকারও করতে পারে না?

হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। অতএব, আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব।

হে আমার পিতা, শাইতানের ইবাদাত করবেন না। শাইতান দয়াময় আল্লাহ তাআলার অবাধ্য; তাই তার আনুগত্য করে কেউ মুক্তি পাবে না।

হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করছি যে আপনি যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আল্লাহ তাআলার শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে, ফলে আপনি শাইতানের বন্ধু হয়ে যাবেন। অতএব, আপনি সতর্ক হোন।"

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ দাওয়াতে পিতা উত্তর দিলেন, "হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার মাবুদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি তোমার

এরূপ কাজ থেকে নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমাকে শেষ করে দেব। অতএব, তুমি আমার সম্মুখ হতে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও।”১ [[১] তাফসীরে ফাতহুল মাজিদ, সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪১-৫০]

পৃথিবীতে এর চেয়ে কষ্টদায়ক কী হতে পারে যেখানে ছেলে বাবাকে কল্যাণ ও মুক্তির দিকে আহ্বান করছে, অথচ বাবা সন্তানকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতার এরূপ আচরণেও রাগান্বিত হননি কিংবা আল্লাহ তাআলার শাস্তি কামনা করেননি; বরং তিনি আরও নম্রভাবে বললেন, “আপনার প্রতি সালাম।”২ [[২] এ সালাম বলতে মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিমদের দেখে যে সালাম দেয় তা উদ্দেশ্য নয়, বরং কারো সাথে বা অজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে কথা-কাটাকাটি হলে সুন্দর করে বিদায় জানানো। যেমনটি সূরা ফুরকানের ৬৩ আয়ে ৬৩ তে বলা হয়েছে।]

জুরাইজের ঘটনা

বনু ইসরাঈলদের মধ্যে একজন ভালো ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল জুরাইজ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সম্ভ্রান্ত ও আল্লাহভীরু মানুষ। ধার্মিকতার জন্য চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। কোনো সমস্যায় পড়লে লোকেরা তাঁর থেকে উপদেশ নিত, দুআ চাইত।

জুরাইজের মতো এত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকেও মায়ের সামান্য অবাধ্যতার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে। একবার মা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। পরিণতিতে ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে সাইয়্যিদুনা আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত ঘটনাটি নিম্নরূপ:

শৈশবে কেবল তিনজন শিশু কথা বলেছে। প্রথমজন ছিলেন ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম দেওয়ার পর মারইয়াম আলাইহিস সালামকে লোকেরা অপবাদ দিতে শুরু করে যে সে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। আল্লাহর ইচ্ছেয় শিশু ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর মায়ের সতিত্বের সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন ঠিক যেভাবে আদম আলাইহিস সালামকে পিতা-মাতা ছাড়া

সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনই তিনিও অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন।

শৈশবে কথা বলা দ্বিতীয় শিশুটি সাক্ষী দিয়েছে জুরাইজের পক্ষে। বর্ণিত আছে, জুরাইজ ইবাদাতের জন্য নির্জনে ঘর নির্মাণ করেন। সেখানেই তিনি সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। চারপাশের কোনো কিছুর ব্যাপারে তাঁর কোনো খেয়াল ছিল না। দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে তিনি ছিলেন অচেতন।

একদিন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর মা দরজা থেকে ডাক দিলেন। জুরাইজ দ্বিধায় পড়ে গেলেন—এক দিকে তিনি ইবাদাতে রয়েছেন, অন্যদিকে মা ডাকছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে এমন অবস্থায় তাঁর কী করা উচিত—সালাত শেষ করা, নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া। তিনি সালাত না ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলেন। মা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোনো উত্তর পেলেন না। ছেলের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাওয়ার সময় অভিশাপ দিয়ে গেলেন: “হে আল্লাহ, ব্যভিচারী মহিলার মুখ দেখার আগে যেন ওর মরণ না হয়।”

জুরাইজ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি; কিন্তু তারপরও মায়ের অভিশাপের পর থেকে লোকেরা তাঁকে নিয়ে সমালোচনা শুরু করে। তারা জুরাইজকে হিংসা করত। তাঁর মানহানি করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল তারা। এক খারাপ মহিলা বিষয়টি জানতে পেরে তাদের সাথে দেখা করে জানায়— তাঁর

সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে সহজেই সে জুরাইজকে কুকর্মে প্ররোচিত করতে পারবে, সমাজে তাঁর মানহানি ঘটাতে পারবে।

সুন্দরী সে মহিলার কোনো নীতিবোধই ছিল না। লোকেরা তার কুকীর্তির কথা ভালো করেই জানত। সে তার সৌন্দর্য নিয়ে খুব গর্ব করত। সে ভাবত তার রূপের জাদু থেকে কিছুতেই কারও মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

তারপর একদিন সে জুরাইজের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে কুকর্মে প্ররোচিত করার চেষ্টা করল; কিন্তু সত্যি জুরাইজ ছিলেন একজন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। মহিলার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। খারাপ মহিলাটা যখন দেখল জুরাইজ তার প্রতি একটুও আকৃষ্ট হলেন না, সে রেগে গেল এবং অপমানবোধ করল। সে বুঝতে পারল তিনি এত বেশি ধার্মিক যে রাতের অন্ধকারে যখন কেউ তাঁর কুকর্ম দেখবে না, তখনও সে আল্লাহকে ভয় করে। লোকটি সত্যি আল্লাহভীরু।

এরপর মহিলাটা নতুন চক্রান্ত করল। এক রাখালকে প্রলুব্ধ করে সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। শিশুটির জন্মের পর মহিলা দাবি করল এটা জুরাইজের সন্তান। এই কথা শুনে সবাই চটে গেল। তখনই গিয়ে জুরাইজের বাড়ি ভাঙতে শুরু করল। তাঁকে মারতে থাকল; কিন্তু জুরাইজ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তিনি বললেন, “তোমরা আমার সাথে এমন করছ কেন?” তারা উত্তর দিল, “এক অসচ্চরিত্রা মহিলার সাথে তুমি ব্যভিচার করেছ। আর সেই মহিলা এক অবৈধ বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।”

জুরাইজ বললেন তিনি এমন কোনো কাজই করেননি। এটা জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। অনেক বুঝিয়ে বলার পরও লোকেরা তাঁকে নিষ্পাপ মানতে রাজি হলো না। তারা তাঁকে মারতেই থাকল। তাঁর বাড়ি ভেঙে ফেলছিল। এ অবস্থা দেখে জুরাইজ সেই নবজাতকটিকে নিয়ে আসার অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন ওই শিশুই তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেবে। এরপর শিশুটিকে আনা হলো। তিনি লোকদের কাছে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন।

এরপর সালাত আদায় করে তিনি শিশুটিকে বললেন, "হে শিশু, তোমার বাবা কে?" শিশুটি জবাব দিল, "অমুক রাখাল আমার বাবা।"

লোকেরা যখন দেখল এতটুকু শিশু তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন নিজেদের বাড়াবাড়ির কথা ভেবে তারা অনুতপ্ত হলো। জুরাইজকে তারা আগের চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। তারা ক্ষমা চাইল। তারা বলল, "সোনা দিয়ে আপনার বাড়ি পুনরায় নির্মাণ করে দেবো।"

কিন্তু জুরাইজ জানালেন যে তাঁর সোনা দরকার নেই। তাঁর দরকার মাটি। আগের মতোই একটি ঘর নির্মাণ করতে চান। তারা সবাই মিলে আগের মতো একটি ঘর তুলে দিল।১ [[১] সহীহ বুখারী, আহাদিসুল-আনবিয়া, হাদীস : ৩৫৩৬; সহীহ মুসলিম, আল-বির-অ-সিলাহ, হাদীস : ২৫৫০]

এই ঘটনায় মায়ের কথার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মায়ের সাধারণ একটা অভিশাপও সন্তানকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারে। এখান থেকে আরও বোঝা যায় যে নফল সালাতের চেয়ে মায়ের অধিকারের গুরুত্ব বেশি।

তেমনিভাবে হিজরতের চেয়েও মায়ের হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাই আমাদের উচিত যতটা সম্ভব পিতা-মাতার অনুগত থাকা।

উমার(রাযী.) -এর কান্না

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী ছিলেন একটি গোত্রের প্রধান। তাঁর ছেলের নাম কিলাব। ছেলেটি ছিল বাবার খুবই বিশ্বস্ত ও অনুগত। দিনে-রাতে সারাক্ষণই সে বাবার জন্য নিবেদিত থাকত। এমন সন্তান পেয়ে বাবা ছিলেন খুবই খুশি। তিনি সন্তানকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে এক মুহূর্তও তাকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। পিতা-পুত্রের মধ্যে এই গভীর ভালোবাসার কথা লোকদের মুখে মুখেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমীরুল মুমিনীন উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কিলাব বিন উমাইয়্যাহ আল-কিনানী মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন। সেসময় ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইসলামী শাসনের কেন্দ্রস্থল মদীনায় এসে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই কিলাব মদীনার জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেন। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পেছনে তিনি অনেক সময় দিতেন।

সেসময় তিনি জানতে পারেন যে ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তাই মুজাহিদদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি খলিফা

উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন। তখন খলীফা তাঁকে ইরাক অভিমুখী মুসলিম বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

একথা জানতে পেরে তাঁর বাবা-মা তাদের নয়নের মণি কিলাবকে আটকানোর জন্য অনেক মিনতি করেন। তারা বললেন যে এখন তারা বৃদ্ধ। তাই তাদের দেখাশোনা করার জন্য ছেলেকে তাদের প্রয়োজন; কিন্তু সন্তান জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর। কিলাব তাঁর পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে বললেন, "আমার প্রিয় মা-বাবা, অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি আপনাদের দুজনকে ছেড়ে যাচ্ছি।" অবশেষে বাবা-মা'কে রাজি করিয়ে তাদের দুআ নিয়ে ইরানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান তিনি।

ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর কথা বাবা-মায়ের ভীষণভাবে মনে পড়ত। সন্তানের কথা চিন্তা করে তারা প্রায়ই কাঁদতেন। অনেকদিন পর এক বিকেলে ছেলের হাতেগড়া খেজুরের বাগানে বসে বৃদ্ধ বাবা-মা কথা বলছিলেন। বৃদ্ধ বাবার চোখ পড়ল একটি কবুতরের দিকে। সুমধুর কণ্ঠে কিচিরমিচির করতে করতে কবুতরটি এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফালাফি করছিল। ছানাগুলোর চতুর্দিকে মা কবুতরটির ওড়াউড়ি দেখে বাবার অন্তর ছেলের জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তাঁর দেখাদেখি বৃদ্ধা মাও কান্না শুরু করলেন। সেদিনের সুন্দর সময়টুকু তারা দুজন ছেলের জন্য কেঁদেই পার করে দিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে উমাইয়্যাহ আল-কিনানী

সন্তানের জন্য এত বেশি কেঁদেছিলেন যে তাঁর চামড়ায় অশ্রুর দাগ পড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তান বিচ্ছেদের দুঃখ সইতে না পেরে একদিন উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে হাজির হন। তিনি তখন মাসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। উমাইয়্যাহ আল-কিনানী তাঁকে বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহর কসম, আপনি যদি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে না আনেন তবে আরাফার ময়দানে আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।"

উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। বাবার মুখে এই কথা শোনামাত্র তিনি তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন। উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনই ইরাকে লোক পাঠিয়ে কিলাবকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পর কিলাব উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে উপস্থিত হন।

উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রশ্ন করেন, "কীভাবে তুমি তোমার বাবার সেবাযত্ন করতে যে তুমি কাছে না থাকায় তিনি এত শোকার্ত হয়ে পড়েছেন; আমাকে একটু খুলে বলো তো?"

কিলাব বললেন, "*নিজের প্রয়োজন পূরণের আগে আমি বাবার প্রয়োজন পূরণ করতাম। তাঁর জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকতাম। সবচেয়ে দুগ্ধবতী উট থেকে তাঁর জন্য দুধ দোহন করতাম। প্রথমে উটটিকে খাওয়াতাম, তারপর সেটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ দিতাম। ঠান্ডা*

করার জন্য এর নিচের অংশ ধুয়ে দুধ দোহন করতাম। তারপর সেই দুধ আমি বাবাকে পান করতে দিতাম।"

এরপর উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাবাকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। বাবা খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বয়সের ভারে তিনি নুইয়ে পড়েছিলেন।

উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, "কিলাবের বাবা, আপনি কেমন আছেন?" উমাইয়্যাহ আল-কিনানী উত্তর দিলেন, "আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে যেমন দেখতে পাচ্ছেন।"

উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, "এই মুহূর্তে আপনার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি কী?" উমাইয়্যাহ আল-কিনানী বললেন, "আজ আমার কিছুই চাওয়ার নেই। কোনো ভালো কিছুই আমাকে খুশি করতে পারবে না। তেমনই কোনো খারাপ কিছুতেও আমি দুঃখিত হব না।"

উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, "ছেলেকে ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুই আপনার চাওয়ার নেই?" উমাইয়্যাহ আল-কিনানী বললেন, "আমার কলিজার টুকরা, আমার সন্তানকে ছাড়া আমার কোনো চাওয়া নেই। মরার আগে আমি তাকে দেখে যেতে চাই। চুমু দিয়ে একটিবার বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই।"

সন্তানের প্রতি বাবার এই গভীর ভালোবাসা দেখে উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে পানি চলে এলো। তিনি বললেন, "চিন্তা করবেন না, আল্লাহ চাইলে আপনার অন্তরের ইচ্ছে পূরণ হবে।"

এরপর উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আড়ালে গিয়ে কিলাবকে বললেন দুধ দোহন করতে। কিলাব একটি উট বেছে নিয়ে দোহন করে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে দুধ নিয়ে এলেন। এরপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধ বাবাকে সেই দুধ দিয়ে বললেন, "দয়া করে দুধ পান করুন!"

দুধের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তিনি যখন তা মুখের কাছে নিলেন, দুধের গন্ধ নাকে আসামাত্র তিনি বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম আমীরুল মুমিনীন, আমি আমার ছেলের হাতের সুবাস পাচ্ছি।"

একথা শোনামাত্র উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন। কিলাবের হাত ধরে তাকে তার বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, "এই আপনার সন্তান। আপনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে নিয়ে এসেছি।"

উমাইয়্যাহ আল-কিনানী সন্তানের দিকে ছুটে গেলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে চুমু দিতে লাগলেন। এমন হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলল। এরপর উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু কিলাবকে বললেন, "পুত্র, যতদিন তোমার বাবা-মা জীবিত আছেন তাদের কাছে থাকো। তাদের সেবাযত্ন করার মাধ্যমে জিহাদ করো। তারা মারা গেলে তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কোরো।"১ [[১] উসদুল গাবা : ৪/৪৫৯, ৪৬০। মাউসুআহ কিসাস-সালাফ, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৮, ইমাম ইবনু আবি দুনিয়াহ : ৩/৪৭৩, ৪৭৪, হাদীস : ২৩৯, ২৪০]

পাথর অপসারণ

বাবা-মা'কে ভালোবাসলে, তাদের সেবা যত্ন করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তানকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে অনেক সংকটময় অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। এমন একটি উদাহরণ পাওয়া যায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে:

একবার তিন যুবক পথ চলছিল। এমন সময় তারা বৃষ্টির মুখে পড়ে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে বড় এক খণ্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে বলল, ‘চলো আমরা আমাদের এমন কোনো সৎকাজের কথা স্মরণ করি যা আমরা একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করেছি’ এবং এর উসিলায় আল্লাহর কাছে দুআ করি যেন তিনি গুহার মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দেন।

তাদের একজন বলল, “হে আল্লাহ, আমার বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতা-মাতা রয়েছেন এবং ছোট ছেলেমেয়েও আছে, যাদের জন্য আমি পশু পালন করি। যখন আমি রাতের বেলা ঘরে ফিরি, প্রথমে পিতা-মাতাকেই আমি দুগ্ধ পান করতে দিই। অতঃপর ছেলেমেয়েকে দিই। একদিন আমি রাতের বেলা দেরিতে ঘরে ফিরে পিতা-মাতা উভয়কেই নিদ্রিত অবস্থায় পেলাম। আমি অন্যদিনের

মতো দুধ নিয়ে তাদের কাছে গেলাম এবং তাদের নিকটে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও চাইলাম না যে প্রথমে আমার ছেলেমেয়েকে দুধ পান করতে দেব। যদিও আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় কান্নাকাটি করছিল। আমি ভোর হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। হে আল্লাহ, যদি আমি এই কাজটি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তবে আমাদের উপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দিন যাতে আমরা আকাশটা দেখতে পাই।" এতে আল্লাহ তাআলা গুহার উপর থেকে পাথরটিকে কিছুটা সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল...।১ [[১] সহীহ আল-বুখারী, ই.ফা.-৩৮৮৭]

বাবা-মায়ের দুআ

একবার মালিক বিন আশজায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ছেলে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের হাতে ধরা পড়লেন। খবর শুনে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন সাহাবী আর তাঁর স্ত্রী। মা কান্না শুরু করলেন প্রাণপ্রিয় ছেলের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন দুঃসংবাদটা পৌঁছল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিম্নোক্ত দুআটি বারবার পড়তে বললেন:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো সামর্থ্য নেই।"

বাবা-মা কায়মনোবাক্যে সন্তানের জন্য দুআ করতে লাগলেন। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিলেন। আল্লাহর হুকুমে অলৌকিকভাবে কারাগারের ভেতরেই আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পায়ের বেড়ি ছিঁড়ে যায়। তিনি সুযোগ বুঝে শত্রুদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আসেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই তিনি একটি উটনী দেখতে পেলেন। সাবধানে উটনীর পিঠে চড়ে বসলেন তিনি। শত্রুদের উটের পালটি তখন কাছেই চরছিল। আস্তে আস্তে পুরো উটের পালটির সাথে মিশে তিনি মদীনার দিকে রওনা দিলেন। উটের পালটিও চলতে শুরু করল সাথে সাথে।

আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু কারাগারে ভয়াবহ নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সারা দেহে যন্ত্রণা নিয়েও তিনি দ্রুত পথ চলতে লাগলেন।

কোথাও সামান্য বিশ্রামও নিলেন না। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে পৌঁছে গেলেন পরিবার-পরিজনের কাছে। বাবা তার কণ্ঠস্বর শুনেই বলে উঠলেন, "কা'বার রবের কসম! এটা আমার ছেলে আউফ।"

মা বলে উঠলেন, "সুবহানাল্লাহ! আমার ছেলে শত্রুদের থাবা থেকে পালিয়ে এসেছে।"

বাবা-মা ও দাসদাসীরা তাঁকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। একই সাথে অনেকগুলো উটও বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করল। সবাই তো আশ্চর্যে হতবাক। আউফ বিন মালিক সব ঘটনা খুলে বললেন। মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তিনি আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উটের ব্যাপারে তাঁর কাছে সবকিছু বললেন। শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমার নিজের উটকে যেভাবে যত্ন করো, এগুলোকেও সেভাবেই যত্ন করবে।" এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল:

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য তিনি (বিপদ থেকে) উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন, এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রি দান করেন—যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"১ [[১] আত-তালাক ৬৫ : ২-৩]

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে আউফ বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাবা-মা যেমন তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন তেমনই তিনিও তাঁর পিতা-মাতাকে অনেক ভালোবাসতেন। মক্কা বিজয়ের সময় আউফ বিন মালিক

আশজা গোত্রের পতাকা বহন করেছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি সিরিয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ তাঁর থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত হাদীসটি আউফ বিন মালিক আশজায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে:

'আমার রবের পক্ষ থেকে একটি দল আমার কাছে এলো। আমার উম্মতের অর্ধেককে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে অথবা আমাকে শাফায়াতের (সুপারিশের) অনুমতি দেওয়া হবে—এই দুটির মধ্য থেকে আমাকে একটি বেছে নিতে বলল। আমি বিচার দিবসের শাফায়াতকেই বেছে নিলাম। আল্লাহর সাথে শিরক করেনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আমি শাফায়াত করব।'১ [[১] জামে তিরমিযী, সিফাতুল কিয়ামাহ, হাদীস : ২৪৪১; সহীহ ইবনু হিব্বান ১৮৬/৬; মুসনাদ আহমাদ : ২৮/৬]

হিজরী ৭৩ সালে আউফ বিন মালিক আশজায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু মারা যান।২ [[২] বিস্তারিত দেখুন আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস : ২৪৪৬; উসদুল গাবা : ৩৭/৫, ৩০০-৩০১/৪; জামে আল-উলুম ওয়াল হিকম : ১/৪৯৩; ওয়াল-আসাবাহ : ৪/৬১৭; ওয়াল-ইসতিয়াব, পৃষ্ঠা: ৫৮৭-৫৮৭]

উত্তম আচরণ ও সম্মান

সাইয়্যিদুনা উমার ইবনু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একজন প্রশ্ন করল, “আপনার সন্তান আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করে?”

উত্তরে তিনি বললেন, “আমি যদি দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যাই, তাহলে সে আমার পেছনে পেছনে থাকে—এভাবে আমাকে সম্মান করে। রাতে সে প্রহরীর মতো আমার আগে আগে হাঁটে। আর আমি বাড়িতে থাকলে সে কখনোই উপর তলায় যায় না—আমাকে অসম্মান করা হবে ভেবে।”১ [[১] সা'আদাত দারাইন ফি বির আল-ওয়ালাদাইন, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮]

পিতা-মাতার সাথে আমাদের পূর্বসূরিদের আচরণ এমনই ছিল। আর আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই তবে আমাদেরও উচিত পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা।

অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে আচরণ

জীবদ্দশায় যে ক'জন বিশিষ্ট সাহাবী জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের বনু যুহরা গোত্রের সন্তান এবং মায়ের খুবই অনুগত একজন।

তিনি খুব অল্প বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তাঁর মা হামনা বিনতে সুফিয়ান অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ছেলেকে এই বলে শাসান যে, “আমি ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার মুখে তুলব না যে পর্যন্ত তুমি তোমার নতুন ধর্ম ত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আসো। আমি এভাবেই ক্ষুধা এবং পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব যাতে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তুমি মায়ের হত্যাকারী হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন হও।”

জবাবে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “আপনি এমনটি করবেন না মা। কারণ আমি কিছুতেই আমার দ্বীন ত্যাগ করব না।”

কিন্তু মা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি সত্যি সত্যি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন। এভাবেই এক দিন এক রাত কেটে যায়। মাকে অত্যন্ত ভালোবাসা সত্ত্বেও মায়ের এ অবস্থায় তিনি দৃঢ়তা হারাননি; বরং তিনি মাকে বললেন, “আল্লাহর শপথ! যদি আপনার দেহে একশত আত্মাও থাকত এবং সেগুলো একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার দ্বীন

ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছে করলে পানাহার করুন কিংবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি কোনোকিছুর বিনিময়েই আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারি না।”

এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মা অনশন করা থেকে সরে আসলেন।১ [[১] সহীহ মুসলিম, ফাযাইলুস সাহাবা : ১৭৪৮, ২৪১২; জামে তিরমিযী, তাফসীরুল-কুরআন : ৩১৬৯; মুসনাদ আহমাদ : ১/১৪৫, ১৮৬]

সাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন:

“আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করাতে চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।”১ [[১] সূরা লুকমান, ৩১ : ১৫]

দীর্ঘায়ু ও সম্পদ লাভ

পৃথিবীতে অনেক দিন বেঁচে থাকতে কে না চায়? কে না চায় স্বচ্ছলভাবে দিন কাটাতে? এ দুটি ইচ্ছে পূরণের একটি নিশ্চিত উপায় আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

‘যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও রিযক বৃদ্ধির আশা করে, সে যেন পিতা-মাতার আনুগত্য করে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।’১ [[১] মুসনাদ আহমাদ : ৩/২৭৭]

ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদীস সংকলন করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

‘দীর্ঘায়ু লাভের একটি উপায় হলো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ।’১ [[১] জামে তিরমিযী, আল-কাদার, হাদীস : ২১৩৯]

কতিপয় হুকামা১ [[১] ‘হাকীম’-এর (একজন জ্ঞানী ব্যক্তি) বহুবচন। ইসলামী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ও বিদ্যার বহু শাখায় জ্ঞানী দার্শনিকদের বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হতো।] বলেছেন— পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করলে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে দীর্ঘ ও উন্নত জীবন লাভ করা যায়। এমনকি কোনো পাপী ব্যক্তি এই কাজগুলো করলে সেও একই নিয়ামত পাবে।

এক ইয়েমেনীর ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনু উমার দেখতে পেলেন এক ইয়েমেনী যুবক তাঁর মাকে পিঠে নিয়ে তাওয়াফরত অবস্থায় বিড়বিড় করে বলছেন— "আমি আজ মায়ের জন্য অনুগত উটের মতো। কোনো কষ্ট বা ভয়ই আমাকে বিরত রাখতে পারবে না।" অতঃপর তাওয়াফ শেষে লোকটি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে বললেন, "হে আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আমার মা আমাকে যত মাস গর্ভে ধারণ করেছেন তার চেয়েও বেশি সময় ধরে আমি তাঁকে বহন করছি। আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি?" আবদুল্লাহ ইবনু উমার জবাবে বললেন, "নাহ, আপনার মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও আপনি দিতে পারেননি।"১ [[১] আল-আদাবুল মুফরাদ ১/৬২]

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় আমরা যতই ভাবি না কেন বাবা-মায়ের জন্য আমরা বিশাল কিছু করে ফেলেছি, আদতে তাঁদের প্রতিদান দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই বাবা-মায়ের হক আদায়ে আত্মতুষ্টিতে না ভোগাই ভালো। আমরা কেবল আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। তাঁরা যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তবে আল্লাহও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন।

“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘উফ’ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।”১ [[১] সূরা বানী-ইসরাঈল, ১৭:২৩]

সমাপ্ত